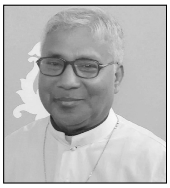

বাণীর দেহধারণঃ মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

বাণী (গ্রীক ভাষায় *ho Logos*), সে-তো মানবকুলের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা। *আদিতে ছিলেন এই বাণী (যোহন ১:১)*, আর বাণীর দেহধারণ তথা মানবদেহধারণ সেই ঈশ্বরেরই প্রকাশ, তাঁর সেই মহাপরিকল্পনারই বাস্তবায়ন। দেহধারিত এই বাণী, ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ উর্ধ্ব থেকে একেবারে নিম্নে এসে মিলিত হলেন মানুষের সাথে, 'তাবু খাটালেন' (গ্রীক শব্দ *eskeneisen*) মানুষের মাঝে; বোধগম্যভাবে বলা যায়, আমাদের মাঝেই বাস করতে লাগলেন *(যোহন ১:১৪)*।

বাণীর দেধারণ: ঈশ্বর-মানুষে মিলন

ঈশ্বর-মানুষে ভেঙ্গে-যাওয়া মিলনকে আবার সঠিক স্থানে রাখতেই মিলনের উৎস প্রভু ভগবান দেহধারিত-ভগবান হয়ে, দেহধারিত বাণী হয়ে মানুষের সাথে মিলন ঘটালেন। এই মিলন এতই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব যে, শুধু মানুষ হয়ে জন্ম নয়, অবহেলিত ও দরিদ্র, হইয়েই তিঁনি জন্ম নিলেন বেথলেহেমের এক গোশালায় *(লুক ২:৭)*। শিশু যিশুর এই দারিদ্র দরিদ্রদের সাথে তাঁর একাত্মতা, তাঁর মিলন। আর দরিদ্ররাই দরিদ্রদের ভালবাসে, তাদের সন্ধান পায়, দৌড়ে যায় 'দরিদ্র শিশু যিশু'র কাছে *(লুক ২:৮-১১)*। ওরা দরিদ্র, তবে তাদের রয়েছে সরল-সহজ অন্তর ও জীবন। সরল-সহজ এই রাখালদের কাছেই দূতের মুখে উচ্চারিত যিশুর আগমনের শুভ সংবাদ- ***"আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিন সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু (লুক ২: ১১)।"***

বিবেচনা করা যেতে পারে যে, রাখালদলের মিলন-সাক্ষাৎ যিশুর সাথে দরিদ্র পাপময় মানবকুলেরই সাথে সাক্ষাৎ। অতএব বলা যায়, ইহলোকে বাণীর দেহধারণ, ঈশ্বর-পুত্র যিশুর মানবজন্ম মানবকুলের সাথে তাঁর মিলনের উদ্দেশ্যেই। যিশুর এই জন্মে যেন অসহায় মানবকুল 'ইম্মানুয়েল' যাঁর নাম, তাঁরই সাথে মিলনাবদ্ধ হল। তাইতো স্বর্গদূতবাহিনীর সাথে গোটা মানবজাতি গেয়ে ওঠে: ***"জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয় (লুক ২:১৪)।"*** পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয়! বড়দিনেও যিশুর সাথে মিলনাবদ্ধ হয়েই যিশু-নামের কীর্তন গেয়ে ওঠে কীর্তনদল। আহ! কি মধুর লাগে পাপ ব্যতীত সবদিক দিয়ে যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ তাঁর সাথে মিলনাবদ্ধ হয়ে বাস করা! এ যেন সীনোডাল স্রোতে মানুষের মাঝে মানুষকে নিয়ে মানুষেরই পরিত্রাণের জন্য এক সাথে পথযাত্রা। যাত্রা শুরু হল যেন যিশুর জন্মের মধ্যদিয়েই। বাণীর দেহধারণ, বাণীর মানুষ হওয়া ঈশ্বর-মানুষে মিলনেরই কারণ!

আমাদের জন্য মিলনের চেতনা: যিশুর সাথে আমাদের মিলন

যিশুর সাথে মিলিত হওয়ার চেতনায় আমরা পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুকে গ্রহণ করি; একই চেতনায় আমরা পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করি। তাঁরই সঙ্গে মিলিত না থাকলে আমরা শুকিয়ে যাব; এই চেতনা নিয়ে আমরা যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ৫ পদ থেকে ৭ পদ পাঠ করি ও ধ্যান করি। তা ছাড়াও যিশুর নাম জপ করতে করতেও আমরা যিশুর সাথে মিলিত থাকতে পারি। যিশুর জন্মোৎসব বড়দিনে আমরা পরিবারে গোশালা তৈরী করে ও এর সামনে বৃষণিক দাঁড়িয়ে ধ্যান করতে পারি। আমাদের হৃদয়-গোশালায় শিশু-যিশুকে স্থান দিয়েও যিশুর সাথে মিলিত হতে পারি।

আমাদের জন্য মিলনের চেতনা: পরস্পরের সাথে আমাদের মিলন

মানুষের সাথে মিলনে যিশু কাউকেও বাদ দেননি। ফরিশীরা তাঁর সমালোচনা করলেও দীনদুঃখী, পাপীতাপী সবাইকে যিশু প্রেমে মিলনাবদ্ধ করেছেন।

আর আমরা? আমাদের চেতনা হল আমরাও একে অন্যের সাথে ভ্রাতৃমিলন রক্ষা করে বসবাস করব। যিশুর শিক্ষা অনুসারে শত্রুর সাথে, যারা আমাদের পছন্দ করে না, যারা আমাদের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করে তাদের সাথেও মিল রাখব। এর জন্য আমরা আমাদের অন্তরটাকে মিলনের অন্তর করে গড়ে তুলব। এই মিলন পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে, গোটা বিশ্বে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে। যিশু তো বিজাতীয়দের সাথেও মিলন রেখেছেন। তাই আমরা কেন পারব না বিভিন্ন মণ্ডলীর এবং অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাথে মিলন রেখে জীবন-যাপন করতে?

আমাদের জন্য মিলনের চেতনা: বিশ্বসৃষ্টির সাথে আমাদের মিলন

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের লাউদাতো সি' পালকীয় পত্রের আহ্বানই হল "সৃষ্টিকে বশীভূত করা *(আদিপুস্তক ১:২৬-৩১ক)*"; তথা সৃষ্টি (ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ, ঈশ্বরের সৃষ্ট পশুপাখী, গাছপালা .... আমরা যেন ধ্বংস না করি। আমরা যেন ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নোংরা না করি; বরং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলি। আর এইভাবেই আমরা বিশ্বসৃষ্টির সাথে আমাদের মিলন প্রকাশ করতে পারি। এমন মিলনে সৃষ্টির মধ্যে জেগে ওঠে অপরিসীম আনন্দ; ঠিক যেমন যিশু ও পরস্পরের সাথে মিলনে বেরিয়ে আসে অন্তরের ও বাইরের আনন্দ।

বাণীর দেহধারণ: অংশগ্রহণ: যিশু

প্রথমেই বলা যায় পুত্র-ঈশ্বর যিশু মানবদেহ ধারণ করে পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরাসরি অংশ গ্রহণ করলেন। চ্যালেঞ্জের মাঝেও যিশু পিতার পরিকল্পনায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন নি। পরিত্যাক্ত পরিবেশে জন্ম নেওয়া; ঈশ্বরত্বকে আঁকড়ে না রেখে মানুষের স্বভাব গ্রহণ করে জন্ম নেওয়া, কেন? পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরাসরি অংশ গ্রহণ করা।

বাণীর দেধারণ: অংশগ্রহণ: মারীয়া ও স্বর্গদূত

মা মারীয়ার সম্মতি না থাকলে সবই তো উল্টোপাল্টা হয়ে যেত, তাই না? মা মারীয়ার সম্মতিই ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মারীয়ার অংশ গ্রহণ। এখানে স্বর্গদূতেরও অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষভাবেই। ঈশ্বরের পরিকল্পনা মারীয়ার কাছে ব্যক্ত হয় স্বর্গদূতেরই মধ্যদিয়ে। স্বর্গদূতের আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করেই মা মারীয়ার অংশগ্রহণ বাণীর দেহধারণ বাস্তবায়নে।

বাণীর দেধারণ: অংশগ্রহণ: মারীয়া ও পবিত্র আত্মা

মারীয়া অমলোদ্ভবা; চির কুমারী। দেহধারি বাণীকে গর্ভে ধারণ করেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে *(লুক ১:৩৫)* । যিশুর দেধারণের রহস্য বাস্তবায়নে পবিত্র আত্মার অংশগ্রহণ এইভাবেই। পবিত্র আত্মার প্রভাবেই মা মারীয়া যিশুকে গর্ভে ধারণ করেন *(মথি ১:১৮)*।

আমাদের জন্য চেতনা: ঈশ্বরের ইচ্ছা নিরূপন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ

আমাদের নিজ জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলিক জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি, তা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে নিরূপন করতে হয়। দূতের মধ্যদিয়ে যেমন, তেমনি কর্তৃপক্ষের মধ্যদিয়ে, পিতা-মাতা, অভিভাবকদের মধ্যদিয়ে, এমন কি পরিস্থিতি বা বাস্তবতার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ পেতে পারে এবং সেই ইচ্ছা পরিকল্পনা আমার/আমাদের ইচ্ছা অনুসারে না-ও হতে পারে। আমরা যখন বুঝে, ধ্যান করে যিশুর মত, মা মারীয়ার মত আমাদের সম্মতি প্রকাশ করি, তা বাস্তবায়ন করি তখরই আমরা ঈশ্বরের সাথে, বাস্তবতার সাথে, অভিবাবকদের সাথে একত্রে যাত্রা করি। যিশু, মা মারীয়া ও পবিত্র আত্মা প্রতিটি কল্যাণ কাজ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের চেতনা জাগায়।

বাণীর দেধারণ: প্রেরণ

বাণী দেহধারণ করে এই পৃথিবীতে এসেছেন। পিতাঈশ্বর দ্বারা তিনি এইভাবেই প্রেরিত হয়েছেন। এই অভিনব উপায়ে তাঁর জন্ম, উর্ধ্ব থেকে মর্তে প্রেরণ বা আগমন উদ্দেশ্যবিহীন নয়। তাঁকে পিতা প্রেরণ করেছেন একটি মুক্তিকামী দায়িত্ব দিয়ে: মানবপরিত্রাণ। *লুক ৪:১৮-১৯* স্পষ্টভাবে এই প্রেরণদায়িত্ব ব্যক্ত হয়েছে।

প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত,

কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।

তিঁনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে,

বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে,

পদদলিত মানুকে মুক্তকরে দিতে

এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।

বড়দিন: বাণীর দেহধারণের মহোৎসব

মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণদায়িত্বের মধ্যদিয়ে আমরা নিজ নিজ বাস্তবতায় এই উৎসবকে সীনোডিয় উৎসব করে তুলতে পারি; একসাথে যাত্রা করতে পারি। তা পারি:

১) নিজের অন্তরকে মিলনের অন্তররূপে গঠিত করে। তবেই পরিবারে, সমাজে, গ্রামে-গঞ্জে সবার সাথে বড়দিনের এই মিলন প্রকাশ পাবে।

২) পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো মিলনের প্রকাশ।

৩) পরিবারে এই বড়দিনে একসাথে গির্জায় যাওয়া;

৪) একসাথে বড়ীতে বাড়ীতে কীর্তন গাওয়া;

৫) সাথে বৈঠক করা, পিঠা খাওয়া মিলনের প্রকাশ।

৬) গুরুব্যক্তিদের শ্রদ্ধা-প্রণাম; ছোটদের স্নেহ-আদর ; স্বামী-স্ত্রীর ভক্তি-প্রণাম এবং আরো হাজারো উপায়ে এই মিলন প্রকাশ করা যেতে পারে।

৭) এমন কি পুরনো দিনের রাগ-অভিমান ভেঙ্গে পুনর্মিলন এই মিলনের প্রকাশ।

৮) পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সাথে আমাদের মিলন ও আন্তরিকতা প্রকাশ করতে পারি।

অংশগ্রহণ এই বড়দিনে

১) একসাথে পরিকল্পনা করি বড়দিনের কর্মসূচী;

২) এক সাথে ঘর সাজানোর কাজে অংশগ্রহণ।

৩) একসাথে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ; উপাসনায় প্রার্থনা, গানে, বাণীপাঠে অংশগ্রহণ করে;

৪) গির্জাঘর সাজাতে, মিশনের অন্যান্য কাজে সহায়তা দান করে অংশগ্রহণ। ধর্মপল্লীর সাথে সহযাত্রিক হই এইভাবেই।

৫) বড়দিনে গির্জায় অনুদান দিয়ে;

৬) দীনদরিদ্রকে দান করে; তাদের নিমন্ত্রণ করে; তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা মিলন ও অংশগ্রহণ প্রকাশ করতে পারি।

৭) পরিবারে একসাথে পিঠা ও অন্যান্য খাবারে অংশগ্রহণ করে;

৮) কীর্তনে অংশগ্রহণ করে; কীর্তনদলের সাথে সজ্জিত মারীয়া ও যোসেফ, মারীয়ার কোলে শিশুযিশুর প্রতিকৃতি। থালায় যথেষ্ট দান করে ;

৯) অন্যান্য ধর্মের মানুষকে দাওয়াত করে পিঠার আসরে অংশগ্রহণ করতে দিয়ে

এবং আরো বহুভাবেই বড়দিনে বাণীর দেহধারণ মহোৎসবে মিলন ও অংশগ্রহণ প্রকাশ করতে পারি।

বাণীর দেহধারণ মহোৎসবে আমাদের প্রেরণ-দায়িত্ব: ধর্মপল্লীতে

১) যাজকদের দায়িত্ব পাপস্বীকার শ্রবণ; মধ্য রাতের ও সকালের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ; গির্জঘরের ভিতরে ও বাইরে সমবেত হবে হাজারো খ্রিস্টভক্ত।

২) মফঃস্বলে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ;

৩) সিস্টারদের দায়িত্ব উপাসনার জন্য বেদী সাজানো; যাজকদের পোষাক সাজিয়ে রাখা; বেদী সাজানো ইত্যাদি।

৪) ফাদারদের দায়িত্ব উপাসনা সুন্দরভাবে পরিচালনা করা; উপদেশ ভালভাবে প্রস্তুত করা;

৫) গানের দল ও পাঠক-পাঠিকাদের দিকনির্দেশনা দেওয়া ফাদার-সিস্টাদেরই দায়িত্ব;

৬) ফাদারদের প্রেরণ-দায়িত্ব হল বড়দিনের আগে বা পরে অসুস্থ ব্যক্তিদের পবিত্র পাপস্বীকার ও পবিত্র কমুনিয়নের ব্যবস্থা করা তাদের গৃহে প্রবেশ করে;

৭) প্যারিশ কাউন্সিলের সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব নিরাপত্তা ও শৃংখলার বিষয় দেখাশোনা করা; স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং আরো।

৮) গানের দলের দায়িত্ব: উপাসনার এমনসব গান বাছাই ও অনুশীলন করা যেগুলো সাধারণ বিশ্বাসীবর্গের জানা।

বাণীর দেধারণ মহোৎসবে প্রেরণ দায়িত: পরিবারে

১) একসাথে বসে সবাই মিলে বড়দিনের জন্য পরিকল্পনা করা বাবা বা অভিভাবকের দায়িত্ব;

২) বাবা অথবা বড় ছেলে বড়দিনের বাজার করা;

অস্ত্রে বিদ্ধ মানবতা

ভিনসেন্ট তিতাস রোজারিও

মৃত্যু ৪০২৯৫, গুরুতর আহত ৫৩৬১৬, হারিয়ে গেছে ১৫০০০, বাস্তুহারা ১৪ মিলিয়ন, বাড়িঘর ধ্বংস ১৪০০০০ এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ৫০ মিলিয়ন ডলার (২৭ নভেম্বর ২০২২)। এগুলি কি কেবল সংখ্যা? না এটা মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, অবহেলা, অবজ্ঞা, হিংস্রতার প্রতিচ্ছবি।

যুদ্ধের কথা বলতে বা শুনতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বলতে হয়, দেখতেও হয়। যুদ্ধ কখনও কারো জন্য ভালো বার্তা বয়ে নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে ধ্বংস, মৃত্যু, দারিদ্র্য আর হাহাকার।

যুদ্ধ করছে ইউক্রেন এবং রাশিয়া কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজের (Global village) সবাইতো একই সূত্রে গাঁথা, সূতার একদিকে টান দিলে অন্যপ্রান্তে টান লাগবেই, ফলে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে যাচ্ছে ভয়াবহভাবে। করোনা মহামারির পরবর্তী সময়ে যখন বিশ্ব প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তখনই এ মানবতাবিরোধী অমানবিক যুদ্ধ।

একটু পেছনের ফিরে দেখা যাক– কেন এ যুদ্ধ? রাশিয়া পরাশক্তি পূর্বে অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিলো এবং পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত এর জোটভুক্ত 'ওয়ারশ' সামরিক জোট ভেঙে যায়। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোর জোট ন্যাটো আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্প্রসারিত অর্থ এই পূর্বের 'ওয়ারশ' ভুক্ত দেশসমূহ এই ন্যাটো জোটে যুক্ত হয়। চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া এবং আরও দেশ এই জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়। ইউক্রেন এর এ জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করেই এই মানবতাবিরোধী যুদ্ধের শুরু।

খাদ্যশস্য এবং জ্বালানি উৎপাদনে ইউক্রেন এবং রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম অংশীদার। ফলে সারাবিশ্বে এর কিরূপ প্রভাব পড়েছে। আবার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেবার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও মুখ থুবড়ে পড়ছে। যেমন: বাংলাদেশ যে পরিমান তৈরী পোশাক রাশিয়া থেকে আমদানী করে প্রায় সমপরিমাণ সার, গম, ধাতব পদার্থ বাংলাদেশ রপ্তানি করে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ গম, তুলা এবং তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে রাশিয়া। বলা যায় যুদ্ধ করছে দুই দেশ কিন্তু অর্থনৈতিক এবং মানবিক বিপর্যয়ে পড়ছে সারা বিশ্ব।

যুদ্ধের সন্ধিঃক্ষণে প্রভু যিশুখ্রিস্টের আগমন অবশ্যই শান্তি ও ভালোবাসার নিঃসীম ঝর্ণাধারা। বিশ্বের ক্রান্তিলগ্নে যিশুখ্রিস্টের আগমন শান্তির সুবাতাস আনবে– এই প্রত্যাশা করছি। কিন্তু যারা বিশ্বের অর্থনীতির চালিকাশক্তি পশ্চিমাদেশসমূহ, চীন, রাশিয়া এরা কি প্রভু যিশুর শান্তির আলোতে আলোকিত হতে চায়? সাধারণ মানুষ অবশ্যই মুক্তি চায় কিন্তু যারা 'আমিই বড় আমিই শ্রেষ্ঠ' মনে করে তাদের কাছে শান্তির বাণী কেবলই মৃত শৈবালের মতো। আসলেই কি তারা প্রকৃত শান্তি চায় নাকি তারা শান্তি চায় তাদের মত করে অর্থাৎ নিজেকে উচ্চ আসনে বসিয়ে রেখে আবির্ভূত করে শোষকরূপে। করোনা ভাইরাসে প্রায় ৬০ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং ২২৫টি দেশের ৪৩ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এই অস্থিরতা ও বিপর্যয় শেষ হতে না হতেই এই যুদ্ধ। সারা বিশ্বের শান্তিকে পদদলিত করে মানুষকে করছে বিপদগ্রস্ত।

ছবি: ইন্টারনেট

'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে,
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি
ঘাতক সৈন্য ডাকি
মারো মারো ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিলে পূজামন্ত্রের স্বর
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর,
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও
ত্বরা'।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতার অংশটি যেন প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে এবং যেন বর্তমানকেই ধারণ করে। রাজনৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে নিজেদের জেদ, প্রতিপত্তি সর্বত্র বহাল রাখতে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা কখনোই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে না। হয়তো-বা কেউ জয়ী হবে, বীরের বেশে পৃথিবী শাসন করতে চাইবে কিন্তু আসলেই কি তারা বিজয়ী? আপাতদৃষ্টিতে যে কোন পক্ষ বিজয়ী হলেও তারা মানুষের শত্রু, মানবতার শত্রু, অশান্তির পথ প্রস্তুতকারক এবং হিংসা নৃসংশতার পথপ্রদর্শক। যিশুখ্রিস্টের আগমনের এই ক্ষণে তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক– 'প্রতিবেশিকে নিজের মতন ভালোবাসো', 'অসহায়ের প্রতি সহায় হও' এই বাণী যেন সাদা-কালো অক্ষরে না থেকে তাদের হৃদয়ে গ্রোথিত হয় এবং অন্তর দিয়ে যিশুর বাণীকে ধারণ করে তাহলেই মানুষ পরিত্রাণ পাবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভগবান বারে বারে দয়াহীন এই পৃথিবীতে শান্তির দূত পাঠিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন– ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ পরিহার করতে কিন্তু তারপরও আমরা জয়ের মোহে অন্ধ। যারা আমাদের ভবিষ্যতে আলোকিত জীবনকে দুঃস্বপ্নের অতলে নিয়ে যায় তাদের জন্য যিশুখ্রিস্টের কাছে প্রশ্ন থেকেই যাবে– 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো?'

বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিতে বড়দিন উৎসবের আনন্দধারা

ফাদার আলবাট রোজারিও

বাংলাদেশ এমনই একটি দেশ বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। এই বৈচিত্রতা দেখা যায় আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য-পানীয়ে, ধর্ম ও আচার-আচরণের মধ্যে। বাংলাদেশ হলো বিভিন্ন ধর্মের একটি মিলনভূমি। অন্যান্য ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসবগুলোর মতো বড়দিন উৎসবও এখানে সাড়ম্বরে পালিত হয়। আমার এই লেখায় আমি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করবো আবহমান কাল থেকে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে বড়দিন উৎসব কিভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সংক্ষেপে সুন্দর করে, কবিতার ভাষায় বলতে গেলে সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্র ভাবে, মহৎ ভাবে মনের আনন্দে সব কিছু করা বা উদ্‌যাপন করা। অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে একটি সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা। বাংলাদেশের সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতি মানেই পবিত্র ও শুদ্ধ মনের চিন্তা ভাবনা। বাংলাদেশের মানুষ ভোগবাদী নয় কিন্তু সংস্কৃতিবান, অসামাজিক নয়, খুবই সামাজিক এবং উৎসব প্রিয়। নির্মলতার মাঝে আনন্দ খুঁজে বের করে নেওয়া। আমাদের চেতনাই হলো সকলের থেকে আলাদা বা সংকুচিত হয়ে নয় বরং যুক্ত হয়ে মুক্তি লাভ করা। আমাদের পরিচর্যায় ও অনুশীলনে আছে আমাদের সংস্কৃতি। এ দেশের মানুষ সমাজ ও মানুষের কথা ভাবে, মানুষের কথা চিন্তা করেই সব কিছু করে। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে প্রধান বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন এভাবেই বাংলার মাটিতে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সারা বিশ্বে যেভাবে যিশুর জন্মোৎসব ঘটা করে উদ্‌যাপিত হয়, তেমনি বাংলাদেশেও দেশীয় উপাদান ব্যবহার করে একটি জনপ্রিয় উৎসবে রূপ নিয়েছে। খ্রিস্টান সহ সবার জন্যই এ উৎসবটি বছরের সবচেয়ে আনন্দপূর্ণ উৎসব।

অবশ্য এটা বলতে দ্বিধা নেই এটি এমন একটি পর্বোৎসব, যেখানে দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। তাই প্রায় সব জায়গায়ই দেখা যায়, একদিকে যেমন নানান ধরনের পিঠার আয়োজন থাকে, তেমনি আবার বিচিত্র রকমের কেকেরও ব্যবস্থা রাখা হয়। বড়দিনে অমরা যেমন পায়জামা, পাঞ্জবী, শাড়ী পড়ে থাকি আবার স্যুট-প্যান্ট, বিদেশী পোশাকও পড়া হয়। অথাৎ একদিকে রয়েছে দেশীয় সংস্কৃতির ধারক, আবার অন্যদিকে রয়েছে বিদেশী বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহক। এরূপ আরও কিছু কছু ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে বড়দিন উৎসবে। বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয় সেই সব অঞ্চলে, যেখানকার খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন অর্থাৎ চারশ বছরের উপরে। এসব অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ভাওয়াল, আঠারগ্রাম, ঢাকা শহর, নোয়াখালী, পাদ্রিশিবপুর, চট্রগ্রাম শহর ইত্যাদি অঞ্চল। অন্যান্য স্থানে দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব বেশি দেখা যায়।

ভারত উপমহাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ও তাদের দ্বারা খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারের সময় থেকেই এখানে বড়দিন উৎসব পালিত হওয়া শুরু করে। এইসব মিশনারীদের মধ্যে প্রথম মিশনারীগণ ছিলেন পর্তুগীজ। তাই বাংলাদেশে আমরা বড়দিন পালন করতে শিখেছি পর্তুগীজ মিশনারীদের কাছ থেকে। কারণ তাদের কাছ থেকেই আমরা প্রথমে খ্রিস্টধর্ম পেয়েছি। বাংলাদেশে পর্তুগীজ মিশনারীগণ এসেছিলেন আজ তার পাঁচ শত বছর হতে চলেছে। বেশ কিছু বছর তারা আমাদের এখানে থেকে বাণী প্রচার করেছেন। চট্রগ্রাম, তেজগাঁও, নাগরী-পাঞ্জোরা, হাসনাবাদ, পাদ্রিশিবপুরের প্রাচীন গির্জাগুলি তাঁদেরই স্মৃতি বহন করে। পর্তুগালের রাজা-রাণীরাও মিশনারী কাজে অনেক অবদান রাখেন। মিশন কাজে রাজারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। যার ফলে বড় বড় গির্জাঘর ও ফাদার বাড়ী নির্মিত হয়েছে এবং রাজাদের বদান্যতায় উৎসবাদি উদ্‌যাপিত হয়েছে অনেক আড়ম্বর ও বর্ণিল আয়োজন সহকারে। সেই আনন্দের ধারা আজও বিদ্যমান।

পর্তুগীজ মিশনারীদের পরে আসে ইংরেজ মিশনারীগণ। পর্তুগীজ মিশনারীদের সময়ে সীমিত পরিসরে বড়দিন পালিত হলেও ইংরেজদের আগমনে অনেক ধুমধাম ও জাঁকজমক সহকারে বড়দিন উৎসব পালন করা শুরু হয়। যে ধারা এখনো অব্যাহত আছে। কিভাবে বড়দিন পালন করতে হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখে আমরা শিখেছি। যে কারণে কিছু কিছু পর্তুগীজ সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই বাংলার খ্রিস্টীয় উৎসবাদিতে ঢুকে পড়েছে। যেমন ফিলিস্ পিঠা। 'ফিলিস্' শব্দের অর্থ আনন্দ। কোন কোন অঞ্চলে পাটিসাপ্টা, পাকন, কাটাকুলি পিঠাও বড়দিনের আনন্দের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বড়দিনে দেশি ও বিদেশী সংস্কৃতির সুন্দর মিশ্রণে গির্জাঘর সাজানো হয়।

পর্তুগালের মত জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, ইতালি, আমেরিকা, গোয়া থেকেও মিশনারীগণ বাংলাদেশে এসেছেন ও বাণী প্রচার করেছেন। বাংলার ধর্মীয় পর্বোৎসবগুলিতে তাঁদের অবদান কোন অংশে কম না। তাই আমরা দেখি বড়দিনে খ্রিস্টমাস্ ট্রি, ক্যারল গান, হ্যাপি অথবা মেরি খ্রিস্টমাস্ সম্বোধন, অর্গান বাদ্যযন্ত্র, আলোকসজ্জা, এগুলোর ব্যবহার রয়েছে যা বড়দিনের উৎসব ও আমেজকে আনন্দময় করে তোলে।

আমাদের উৎসবগুলোতে কিছু উপাদান বা জিনিস ব্যবহার করা হয় যেগুলিকে ভুল শিক্ষার কারণে হিন্দু সংস্কৃতি বলার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যা মোটেই সঠিক নয়। যেমন: আরতি, অঞ্জলি, গায়েহলুদ, মুদ্রা, আসন, পঞ্চপ্রদীপ, পদ্মফুল, কাসার ঘটিবাটি, ডাব, খোল, করতাল, মন্দিরা, কীর্তন ইত্যাদি। কিন্তু এগুলিতো কোনভাবেই শুধুমাত্র হিন্দুর না বরং বাংলার দ্রব্যাদি ও আচার-আচরণ। তাই আমাদের বর্জন সংস্কৃতি থেকে বেড় হয়ে উপযোগীকরণের সংস্কৃতিতে ঢুকতে হবে।

বড়দিনের উৎসবগুলো পালন করা শুরু হয় ২৪ ডিসেম্বর থেকে। মধ্যরাতে খ্রিস্টযাগে যোগদানের মধ্যদিয়ে শীতকালের গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। গির্জার গুরুগম্ভীর স্বরে ঘন্টাধ্বনি, হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, তানপুরা, সেতার, ভায়োলিন, মন্দিরা-করতাল যোগে মোহময়ী সুরে বড়দিনের গান শিশুরূপে ঈশ্বরপুত্রের জন্মের মাহেন্দ্রক্ষণটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবেই

(৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঈশ্বরের প্রশংসায় উল্লসিতা মারীয়া

সিস্টার পুসন বার্থা রোজারিও আরএনডিএম

মা- পৃথিবীতে এক অনন্য সম্পদ। পৃথিবীর ইতিহাসে ও অবিরাম কালের প্রবাহে মা একজন অতুল্য ব্যক্তিত্ব। মাতা-মণ্ডলীর সীমান্ত জুড়ে, পবিত্র বাইবেলের লেখনীগুলোতে আমাদের সকল মায়েদের আদর্শ "মা-মারীয়াকে" আমরা দেখি একজন পবিত্রা ও নিষ্কলঙ্কা নারীরূপে। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের মনোনীতা। কিন্তু আমাদের মনের কোনে প্রশ্ন উদিত হতে পারে, শুভ বড়দিনে অর্থাৎ প্রভু যিশুর শুভ জন্মতিথিতে আমরা মা-মারীয়াকে নিয়ে কেন ধ্যান করবো?

মা-মারীয়াঃ

যিনি প্রভু যিশুর মা হওয়ার মধ্যদিয়ে আমাদের গোটা মানব জাতির মা হয়েছেন। আমরা সবাই তাকে **"মা"** ডাকি। তিনি পাপী-সাধু, ধনী-গরিব ভেদাভেদ করে বলেন না পাপী যারা তারা আমায় মা ডাকবে না। বরং তিনি পাপীর মন পরিবর্তনের জন্য দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করেন। অবহেলিত সন্তানকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন। তিনি জন্ম থেকে যেমন ঈশ্বরের মনোনীতা ও বিশুদ্ধ ছিলেন, আজ অবধি তিনি ঈশ্বরের মহান ইচ্ছায় আমাদের জন্য মঙ্গল ও আশ্চর্য কাজ সাধন করে যাচ্ছেন।

- মারীয়া কিভাবে ঈশ্বরের প্রশংসায় উল্লসিতা? আমরা দেখি "মাতৃগর্ভ থেকে স্বর্গোন্নোয়ন" পুরো জীবন জুড়ে মারীয়ার জীবন ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখরিত এক জীবন্ত সারাংশ। মারীয়া মাতৃগর্ভ থেকে আদি পাপ বর্জিতা। তাকে বলা হয় নবীনা হবা। এদেন উদ্যানে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবা স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার পরেও শয়তান দ্বারা প্রলোভিত হয়েছেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে মা-মারীয়া অনেক প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যদিয়ে গেলেও তিনি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে ছিলেন প্রার্থনাশীল, পরোপকারী, বাধ্য ও সুচিন্তার অধিকারিণী। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তিনি বিশ্বাসে বাধ্য হয়ে জীবনের যাত্রা পথে পথ চলেছেন। আমরা আমাদের জীবনের দিকে তাকালে কি দেখি- নিত্য দিনের দৈন্যদশা, হতাশা, অত্যাধিক প্রত্যাশা, অভাব, হিংসা, আঘাত, মৃত্যু আমাদের লক্ষ্য ও স্থির উদ্দেশ্য থেকে আমাদের আড়াল করে ফেলে। কিন্তু মারীয়া অতি সাধারণ পরিবারে ও পরিবেশে বেড়ে উঠেও নিজেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অটল রেখেছেন। মারীয়া তাঁর জীবনে এই বিশেষ অনুগ্রহ দানের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরবগীতি নিত্য নিত্যই গেয়ে উঠেছেন।
- মারীয়া ঈশ্বরের পুত্রের জননী হবার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ লাভের আমন্ত্রণে নিজেকে দীন দাসী হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি নিজিকে অযোগ্য রূপেই ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের তাঁর অঙ্গিকার পূরণের উদ্দেশে মারীয়াকে যোগ্য করে তাঁর মুক্তিদায়ী পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ এক হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছেন। কুমারী অবস্থায় মা হওয়ার মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনায় মারীয়া তাঁর বিনীত ও গুরুত্বপূর্ণ "হ্যাঁ" বলেছেন। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছিল, *"প্রণাম তোমায়! পরম আশিসধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন। তুমি পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে ও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে। তাঁর নাম রাখবে যিশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন (লুক ১:২৮, ৩১, ৩৫)।"* ভয় মিশ্রিত হলেও সেই দিন মারীয়ার মনে ঈশ্বরপুত্রের জননী হওয়ার আনন্দ কোন কিছুই নিবৃত করে নিতে পারেনি। এমনকি কোন লজ্জা, দুর্নাম, পাছে লোকে কিছু বলে সব কিছু পিছনে ফেলে মারীয়া পাপের দাসত্ব থেকে মানব মুক্তির ইতিহাসে অবর্ণনীয় ভূমিকা রেখেছেন। মারীয়ার জীবনের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোই যথেষ্ট সারা জীবন ধরে প্রভুর মহিমা গান গাওয়ার জন্য।
- মারীয়ার জীবন ছিল সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নির্ভর। তিনি যোসেফের বাগদত্তা বধূ হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য ঈশ্বরকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কি আশ্চর্যজনক এক ব্যাপার। যাকে দেখতে পাই না, স্পর্শ করতে পারি না তাঁর প্রতি এতো গভীর বিশ্বাস, প্রেম বা ভরসা কি আমি, আপনি আদৌ রাখতে পারবো? কঠিন প্রশ্ন বটে। মারীয়া কিন্তু তাঁর জীবন দিয়ে স্বাক্ষ দিয়ে গেছেন যে হ্যাঁ, তা সম্ভব। তাইতো তিনি স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের কাছ থেকে যিশুর আগমনের বার্তা শুনার পর, তাঁর ঈশ্বরভীরুতা ও প্রেমপূর্ণ বিশ্বাসকে পুজি করে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তাঁর আত্মীয়া এলিজাবেথের সাথে স্বাক্ষাৎ করতে ছুটে গিয়েছিলেন। এলিজাবেথ ও মারীয়ার শুভ স্বাক্ষাতে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে প্রভুর প্রশংসা গানে মুখরিত হয়েছিলেন।
- যিশুর জন্মের শুভ সংবাদে মারীয়ার মনে আত্মোপলব্ধি জেগেছিল যেন তিনি ঈশ্বরের মনোনীতা, তাঁর মতো দীন দাসীর প্রতি ঈশ্বর কতোইনা মহা পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর বিনীত ও সাধারণ জীবনকে ঈশ্বর তাঁর মহা পরিল্পনার মধ্যদিয়ে ধন্য করেছেন। তাইতো প্রাণ ভরে মারীয়া পরমেশ্বরের মহিমা গান গেয়েছেন।
- যিশু মারীয়ার গর্ভকে অলংকৃত করেছেন। তিনি মরীয়ার জীবনকে আনন্দ ও আলোয় পরিপূর্ণ করেছিলেন। প্রতিটি নারীর জীবনে মা ডাক শোনাটা এক অতি প্রত্যাশিত স্বপ্ন। ঈশ্বরপুত্র যিশু প্রথম মারীয়াকে মা ডেকেছেন। মাতৃ স্নেহে, স্তন্যপানে, সোহাগে-শাসনে যিশুকে বড় করে তুলেছেন। কোন দোলনায় নয় নিজের কোলে পিঠে করে যিশুকে পরিচর্যা করেছেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা সত্যিই দুর্জ্ঞেয়। মা-মারীয়ার জীবনও তেমনি বিচিত্রভাবে শত আশীর্বাদে ধন্য করেছেন ঈশ্বর। তাইতো মারীয়াও গেয়েছেন *"আমার পরিত্রাতার কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত (লুক ১:৪৭)।"*
- মারীয়া ঈশ্বরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি নিজেও বলেছেন *"আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে , তিনি তাঁর সেবক ইস্রায়েলের সহায় হয়েছেন (লুক ১:৫৪-৫৫)।"* যিশুর জন্ম নিতান্ত গোশালায় হবার পরেও পূর্ব দেশের তিনজন পণ্ডিত দামী উপহার ও রাখালেরা যিশু প্রণাম ও স্বাগতম জানাতে এসেছেন। ঈশ্বয় স্বয়ং নবজাতক শিশু যিশু- মারীয়া -যোসেফকে সকল সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা ও সাহায্য করেছেন।

মারীয়ার উল্লাস মুখর জীবনকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে চাইলে যিশুর গোটা জীবনের ধ্যান চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। মারীয়া তাঁর জীবনকে ঈশ্বরের বিচিত্র ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় বেধে নিয়েছেন আনন্দেও বন্ধনে। তাই তিনি তাঁর যাপিত-জীবনের রহস্যে ও রচনায় নিয়তই ঈশ্বরের অনুগৃহীতা হয়ে কৃতজ্ঞতায়ও উল্লসিত মনে প্রভুর প্রশংসা ও গৌরব কীর্তন করেছেন॥

আমাদের জীবনে বড় দিনের মাহাত্ম্য

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিউরিফিকেশন সিএসসি

ছবি: লিটন আরিন্দা

প্রভু যিশু আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বাইশ বছর আগে ২৫ ডিসেম্বর এই পৃথিবীর বুকে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর এই দিনটিকেই বলা হয় বড়দিন। সত্যিকার অর্থে আসলেই এই দিনটি বড় দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ আনন্দ করে এবং আমরাও যথাযথ ভক্তি, ভাবগাম্ভীর্যের সাথে দিবসটি পালন করে থাকি। "হেরোদ রাজার রাজত্বের সময়ে যিহুদিয়ার বেথলেহেম গ্রামে একটি গোয়াল ঘরে পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা কুমারী মারীয়ার মাধ্যমে যিশু জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত পক্ষে যিশুখ্রিস্ট পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যা অসম্ভব, কিন্তু হ্যাঁ, মানুষের দৃষ্টিতে যা অসম্ভব ঈশ্বর তাই সম্ভব করতে পারেন। কারণ তিনিই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা।

প্রতিটি মানুষের জীবনেই এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের জীবনেও বড়দিনের মাহাত্ম্য অনেক গভীর যা আমাদের সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হলো বড়দিন। বড় দিন মানে মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া নির্দশন ও অনুগ্রহের শ্রেষ্ঠ দিন। বড়দিন মানে অনেক আনন্দের আর উৎসবের দিন, তাই আজ বড়দিন। বড়দিন মানে মনের কালিমা মুছে ফেলার দিন। সকল ভেদাভেদ ভুলে মানুষের সাথে মিলনের দিন। বড়দিন মানে খারাপ কাজ, মিথ্যা কথা, চালাকি, প্রতারণা, ভণ্ডামি ছেড়ে ভালো পথে চলার দিন। বড়দিন মানে পবিত্র, নিষ্পাপ, প্রেমময়, দয়াময় আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্ম দিন, তাই আজ শুভ বড়দিন।

পারস্য বা ইরানের পণ্ডিতেরা আকাশের তারা গণনা করে জানতে পারলেন যে, প্রভু যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন তাই তারা যিশুকে এক নজর দেখার জন্য অনেক দূরের পথ ছুটে গিয়েছিলেন। স্বর্গদূত রাখালগণকেও দর্শন দিয়ে যিশুর জন্মসংবাদ দিয়েছিলেন। রাখালগণ প্রান্তরে মেষের পাল রেখেই যিশুকে খুঁজতে থাকেন এবং অবশেষে পণ্ডিতেরা ও রাখলরা যিশুকে গোয়াল ঘরে যাবপাত্রে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাদের সাধ্যমতো যিশুকে উপহার দিয়ে জন্মদিন স্বার্থক করে তুলেছিলেন।

আমদের জীবনে বড়দিনের সার্থকতা কোথায়? উপহার দেওয়াতে নাকি উপহার নেওয়াতে, ত্যাগ-স্বীকারে নাকি ভোগ-বিলাসে? বড়দিন সার্থক হবে যদি আমরা জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এবং যিশুখ্রিস্টকে হৃদয়-মন দিয়ে ভালোবাসি। বড়দিন সার্থক হবে যদি আমরা যিশুকে অন্বেষণ করি এবং মানুষের উপকার করি। বড়দিন তখনই আরো বেশী সার্থক হবে যখন আমরা মানুষের দুঃখ-কষ্টে ও বিপদে সান্ত্বনা দেই এবং সাধ্যমতো উপকার করি। যিশুখ্রিস্ট আমাদের জীবনে একমাত্র ত্রাণকর্তা এবং এটা হৃদয়ে লালন ও পালন করার প্রয়াসই হলো বড়দিনের সত্যিকারের সার্থকতা। আমরা যখন খ্রিস্টকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করব, যখন আমরা একে অন্যকে সম্মান করব, ভালোবাসবো, নির্ভর করব তাঁর উপর আস্থা রাখব এবং যিশুকে যখন নিজ হৃদয়ে স্থান দেব তখনই বড়দিনের চরম সার্থকতার প্রকাশ ঘটবে।

মতের অমিল থেকে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব থেকে সংঘাত, সংঘাত থেকে রক্তপাত, লুটপাট, অত্যাচার, অবিচার, অনাচারে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পৃথিবী, কিন্তু কিছু মানুষ ত্রাণকর্তার অপেক্ষা করছিলেন। *মথি লিখিত সুসমাচারে (১:২১)* বলা আছে কুমারী মারীয়া একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন এবং তার নাম রাখলেন যিশু (ত্রাণকর্তা)। কারণ তিনি নিজের লোকদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন। যিশু নামের অর্থ ত্রাণকর্তা বা উদ্ধারকর্তা বা রক্ষাকর্তা। ঈশ্বর পবিত্র আর আমরা পাপী। তাই পাপ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে যাওয়া যায় না। পাপের শাস্তি অনন্ত মৃত্যু। তাই প্রভু যিশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে আসলেন যেন পাপী পাপের ক্ষমা পায় এবং অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মানুষ স্বর্গে যেতে পারেন। প্রভু যিশুখ্রিস্ট কেবল মাত্র আমাদের পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে আসেন নি, বরং তিনি এসেছেন যেন সমস্ত মানব জাতি পরিত্রাণ পায়। এই পৃথিবীর সব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ও মানুষে মানুষে বন্ধনকে আরও সুসংহত করতে প্রভু যিশু মানুষের রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ আগমনের তিথি স্মরণ করে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে জাঁকজমকের মধ্যদিয়ে এই শুভ বড়দিন উৎসব পালন করে থাকে। পুণ্যময় বড়দিন আমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব তা বলা বাহুল্য। আমাদের কাছে এই দিনটির ধর্মীয় তাৎপর্য ও গুরুত্ব অসামান্য। বর্তমান বিশ্বে বছরের যে কোন দিন ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিকভাবেও এতটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আর তাই বড়দিন উৎসব এখন আর শুধু খ্রিস্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সব ধর্মের বর্ণের মানুষের কাছে তাই এর আবেদন ক্রমেই উর্ধ্বমুখী। সকলেই বিপুল আগ্রহ সহকারে দিবসটি উদ্‌যাপন করে থাকে। বাণিজ্যিককরণের ফলে বড়দিন উৎসবগুলো বর্তমানে যদিও অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতা ও আচার সর্বস্ব অনুষ্ঠান। তথাপি আমরা যারা যিশুখ্রিস্টের অনুসারী তাদের কাছে এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। পবিত্র বাইবেল ও ধর্মীয় দিক থেকে ২৫ ডিসেম্বর দিনটি শুধু মানব জাতির ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন নয়, বরং চিরমঙ্গলময় ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে ভালোবাসর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের হৃদয় থেকে লোভ, হিংসা, অহংকার, কামনা-বাসনা ও মিথ্যা দূর করলেই বড়দিন পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হবে। আসন্ন বড়দিনকে সামনে রেখে আমরা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করি আমরা একে অন্যকে ভালোবাসবো, শ্রদ্ধা করবো, সম্মান করবো। আমরা অন্যের ক্ষতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবো। আমাদের লোভ, অহংকার, হিংসা, মিথ্যা কথা, চালাকি, ভণ্ডামি ও প্রতারণা নিজেদের জীবন থেকে বিতারিত করবো। আর এমনি ভাবে প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্ম দিনকে সার্থক করে তুলবো॥ ৎ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. প্রতিদিনের সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১॥

বড়দিনের সামগীত: মুক্তি ও ন্যায় বিচারের জয়গান

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

প্রতি বছর বড়দিনের আগেই আমরা শুনতে থাকি এই পবিত্র মহোৎসবের অনেক আনন্দপূর্ণ গান। ইংরেজি ভাষায় যেমন বহু Christmas Carrols যুগ যুগ ধরে Classic হয়ে আছে (যেমন- Silent might Holy night, Hark the heral the Angels sing, Joy to the world, ইত্যাদি গান), তেমনি বাংলা ভাষায়ও বড়দিনের অনেক গান আমাদের সমাজে বহু বছর ধরেই জনপ্রিয় হয়ে আছে। প্রভু যিশুর জন্মোৎসব উপলক্ষে এই সব গান না শুনলে বা গাইলে বড়দিনের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

কালজয়ী, অনুপ্রেরণাদায়ক বড়দিনের গানে সাধারণত দেখি অপূর্ব সুরের মূর্ছনা ও স্মরণীয় ছন্দ মেলায় গাঁথা প্রভু যিশুর আগমনের প্রতিশ্রুতি বিষয়ক বাণী, তাঁর অতি দরিদ্র বেশে, গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহণের হৃদয়গ্রাহী কাহিনীর ভিত্তিতে রচয়িতার নিজস্ব অনুধ্যান অথবা পরমেশ্বরের 'বাণী' মানব দেহধারণের তাৎপর্য সম্পর্কে সমসাময়িক ঐশতাত্ত্বিক চিন্তা।

বড়দিনের এই পবিত্র সময়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানব দেহ ধারণ করে আমাদের যে 'মুক্তি' বা 'পরিত্রাণ' এনেছেন, তার প্রকৃত অর্থ কী? তিনি তো এসেছেন নতুন জীবন দিতে, অনন্ত জীবন দিতে। আমাদের এই শ্রান্ত-ক্লান্ত জীবনকে প্রাণবন্ত করতে হৃদয়-মনকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করতে। তিঁনি তো এসেছেন এই জগৎ এবং গোটা সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে। সে জন্যেই তো প্রতি বড়দিনে ভাবি এবার প্রভু যিশুর আগমনে তিঁনি আমাকে কী দিতে চাইছেন? আমাদের পৃথিবী, পরিবেশ ও সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যায়, অবিচার, অশান্তির মাঝে তিঁনি কী কী শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন?

তাই বড়দিনের গান রচনা কালে স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে বা সুসমাচারে বর্ণিত যিশুর বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনী, তাঁর প্রচারিত বাণী ও তাঁর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা। কিন্তু পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের "সামসঙ্গীতেও" যে আছে প্রভুর আগমনের বিষয়ে অনেক কথা, আর তাঁর উদ্দেশে মহাস্তুতি গান তা প্রায়ই ভুলে যাই। এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় বড়দিনের তিনটি উপাসনায় আছে সামসঙ্গীত নং ৯৬, ভোরের উপাসনায় সামসঙ্গীত নং ৯৭ এবং দিনের বেলার উপাসনায় সামসঙ্গীত নং ৯৮। এই তিনটি সামসঙ্গীত থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি পদ গেয়েই আমরা এই বিশেষ দিনে প্রভুর জয়গান করি।

খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এই তিনটি সামসঙ্গীতে রয়েছে প্রভু যিশুর আগমনে পাওয়া 'মুক্তি' বা 'পরিত্রাণের' বিষয় আর আছে তাঁর রাজত্বের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত। যেমন ৯৬ নং সামসঙ্গীতের ১-৩ পদে আমরা পাই':

"প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী;
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম,
দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।
জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।"

এর পর ১১-১৩ পদে আছে:

"আকাশ মণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক,
গর্জে উঠুক সাগর ও তার যত প্রাণী;
উল্লাস করুক মাঠ ও মাঠের সব কিছু
বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করুক
সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন;
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ
বিশ্বস্ততার সঙ্গে জাতি সকলকে বিচার করবেন।"

এই সামসঙ্গীতটির প্রথমাংশে রয়েছে আমাদের প্রতি নির্দেশ, যেন প্রতিদিনই তাঁর দেওয়া 'পরিত্রাণের' কথা প্রচার করে যাই। আর শেষের তিন পংক্তিতে দেখতে পাই যে তিঁনি আসছেন পৃথিবী বিচার করতে, ধর্মতার সঙ্গে জগত, বিশ্বস্ততার সঙ্গে জাতিসকলকে। ইংরেজি ভাষায় এই পদটির কথা এরূপ:

They shall exult before the Lord,
for he comes
for he comes to rule the earth.
He shall rule the world with Justice
and the peoples with his constancy."

(Christmas Mass at Midnight, Vatican II Sunday Missal, Millennium Edition, Pauline Books and Media, Boston 2001, P. 75-76)

বোঝাই যাচ্ছে সে তাঁর রাজত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধার্মিকতা ও ন্যায় পরায়নতা। তিনি আসছেন ন্যায় বিচারের উদ্দেশে। তিনি আসছেন দেখতে যে এই পুনরুজ্জীবিত জগৎ তাঁর ঐশ্বরীয় উদ্দেশ্যে চলছে কিনা? তাইতো, তাঁর আগমনে আমরা আহূত হই এই জগতে ন্যায্যতা স্থাপনের কাজে নিযুক্ত হতে; ন্যায় বিচারে লিপ্ত থাকতে। এই পৃথিবীতে সেই ন্যায়ের রাজ্যই যেন বিরাজ করে তার জন্যে আমরা উপাসনায় এক প্রাণ হয়ে, সকলের সাথে প্রার্থনা করি। আর মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে যাই প্রভু যিশুর স্তুতিগান। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে ধর্মময় প্রভু আমাদের প্রার্থনা শুনেন। তিঁনি আমাদের অন্তরের ডাকে সাড়া দেন। তেমনি, ৯৭ নং সামসঙ্গীতের ১-২ পদে আমরা পাই:

"প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী মেতে উঠুক,
যত দ্বীপপুঞ্জ আনন্দ করুক।
মেঘ ও অন্ধকার তাঁর সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
ধর্মময়তা ও ন্যায় তাঁর সিংহাসনের ভিত।"

আবার ৬ পদে আছে:

"স্বর্গে তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করে,
সর্ব জাতি তাঁর গৌরবের দর্শন পায়।"

এখানে দেখি খ্রিস্টরাজার রাজত্বের স্বরূপ:
ধর্মময়তা ও
ন্যায় তাঁর সিংহাসনের ভিত, আর স্বর্গ তাঁর
ধর্মময়তা ঘোষণা করে।

এভাবে, ৯৮ নং সামসঙ্গীতেও আমরা পাই
প্রভু যিশুর আগমনে 'পরিত্রাণের আশ্বাস,
আর তাঁর ন্যায় বিচারের ঘোষণা। যেমন ওই
সামসঙ্গীতের দ্বিতীয় পদে আছে:

"প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ,
জাতি-বিজাতির চোখের সামনে আপন
ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ,"

ইংরেজী ভাষায় এই পদটি এরূপ:

The Lord has made his solution known;
in the sight of the nations he has revealed his justice."
(Reference same as above, P.85)

শুভ বড়দিনে এই তিনটি সামসঙ্গীত দিয়ে প্রভুর স্তুতিগান করা কতইনা অর্থপূর্ণ। কত স্পষ্ট করে এখানে ব্যক্ত হয়েছে প্রভুর আগমনে পাওয়া 'মুক্তি' আর 'ন্যায্যতা স্থাপনের' গভীর সম্পর্ক বা সংযোগ। তাইতো বলি, বড়দিনের এই তিনটি সামসঙ্গীত "মুক্তি আর ন্যায় বিচারের জয়গান।"

বড়দিনের সামগীত আমাদের অনুপ্রেরণা দিক নতুন চেতনায় প্রভুর আগমনের বন্দনা গীত গাইতে। এই চিন্তা নিয়ে, ৯৬ নং সামসঙ্গীতের ভিত্তিতে ও অনুপ্রেরণায় যে গানটি আমার এসেছিল, তারই কথা (Lyric) ও স্বরলিপি নিম্নে দেওয়া হলো। গানটি "আমার প্রাণের সামগীত" দ্বিতীয় খন্ড গ্রন্থে, প্রতিবেশী প্রকাশনী দ্বারা ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

৯৬। প্রভুর উদ্দেশে

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান
তুমি গাও নতুন গান।
সমগ্র পৃথিবী কর তাঁরই গান
দিনের পরে দিন প্রচার কর
তাঁরই পরিত্রাণ।

১। সকল জাতির কাছে প্রচার কর
তাঁরই মহা কীর্তির বন্দনা
সমগ্র পৃথিবী তাঁরই যে গড়া
আকাশের সৃষ্টি তাঁরই রচনা।

২। সকল জাতিকে তিনি বিচার করেন
ন্যায্যতারই ওই বিধানে
আনন্দ কর সমগ্র ধরণী
জয়গান কর তাঁর নতুন গানে ॥

II	পা মা পা সাঁ	সাঁ । । রাঁ	র্ণ সাঁ ণা ধা	পা । । ।
	প্র ০ ০ ০	ভু ০ র্	উ ০ দ্দে ০	শে ০ ০ ০ II
	পা মা জ্ঞা রা	সা । রা ণা	সা রা জ্ঞা রা	সা । । ।
	গা ও ন তুন্	গা ন্ তু (স) ম্মি	গা ও ন তুন্	গা ০ ০ ন্
	মা পা । পা	মা পা জ্ঞা ।	মা পা না না	সাঁ । । ।
	স ম ০ গ্র	পৃ থি বী ০	ক র তাঁর্ ই	গা ০ ০ ন্
	সাঁ জ্ঞাঁ । রাঁ	সাঁ রাঁ সাঁ ।	ণা ণা । ধা	পা । । ।
	দি নে র্ প	রে ০ দি ন্	প্র চা র্ ক	র ০ ০ ০
	মা জ্ঞা মা মা	পা । । ।	II	
	তাঁর্ ই প রি	ত্রা ০ ০ ণ্		
II	জ্ঞা জ্ঞা । রা	জ্ঞা । জ্ঞা রা	সা রা । ণা	সা । । ।
	স ক ল্ জা	তি র্ কা ছে	প্র চা র্ ক	র ০ ০ ০
	মা মা মা পা	জ্ঞা । জ্ঞা মা	রা জ্ঞা । রা	সা । । ।
	তাঁর্ ই ম হা	কী র্ তি র্	ব ০ ন্ দ	না ০ ০ ০
	মা পা । পা	না না না ।	সাঁ । সাঁ না	সাঁ । সাঁ ।
	স ম ০ গ্র	পৃ থি বী ০	তাঁ র্ ই যে	গ ০ ড়া ০
	সাঁ রাঁ ণা ।	ণা । ণা ধা	পা ধা ণা ধা	পা । । ।
	আ কা শে র্	সৃ ষ্ট টি ০	তাঁর্ ই র চ	না ০ ০ ০
II	{ মা পা । পা	না না না না	সাঁ সাঁ । না	সাঁ । । ।
	{ স ক ল্ জা	তি কে তি নি	বি চা র্ ক	রে ০ ০ ন্
	সাঁ রাঁ রাঁ ।	সাঁ । ণা ।	ধা । ণা ধা	পা । । । }
	ন্যা ০ য্য ০	তা র্ ই ০	ও ই বি ধা	নে ০ ০ ০ }
	পা জ্ঞাঁ । রাঁ	জ্ঞাঁ রাঁ সাঁ ।	সাঁ রাঁ । ণা	সাঁ সাঁ সাঁ ।
	আ ন ন্ দ	ক ০ র ০	স ম ০ গ্র	ধ র ণী ০
	সাঁ সাঁ সাঁ ।	ণা ধা পা ।	মা জ্ঞা । রা	সা । । । IIII
	জ য় গা ন্	ক র তা র্	ন তু ন্ গা	নে ০ ০ ০

সংকটময় বিশ্বে মুক্তিদাতার জন্মতিথি বার্তা

আলবার্ট বকুল ক্রুশ

"বড়দিন" জগৎ পরিত্রাতা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। চারিদিকে উৎসবের আমেজ। আর হবেই না কেন! এ যে স্বয়ং ঈশ্বরতনয় মুক্তিদাতা যিশুর জন্মতিথি। বিশ্বে সকল উৎসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ উৎসব এটি। আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, বৈষয়িক, ব্যবসায়িক সকল অর্থেই এর আয়োজন ও গুরুত্ব ব্যপক। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা যিশুর মানবদেহধারণ, মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ, মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহন এসব একই সূত্রে গাঁথা, একই উদ্দেশ্য আর তা হল মানবজাতির মুক্তি। আর এ মুক্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হল যিশুর মানবদেহ ধারণ যা আমরা পালন করি বড়দিন উৎসব হিসেবে। তাই সময়ের মাপকাঠিতে নয় বরং মাহাত্ম্যের কারণেরই এটি বড়দিন।

বড়দিনের মাহাত্য কি? একটি কি শুধুই এটি উৎসবের উপলক্ষ মাত্র যা প্রতি বছর উৎসবের আমেজ নিয়ে ফিরে আসে! নাকি তা আমাদের জন্য কোন বারতা নিয়ে আসে! দূতেরা তাঁর জন্মে গেয়েছিলেন, *"জয় উর্ধ্বলোকে জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তার অনুগৃহীত মানবের অন্তরে (লুক ২:১৪)।"* যিশু তাঁর পিতার শান্তি নিয়ে এ ধরাধামে নেমে এসেছিলেন মানব জাতিকে শান্তি দিতে। কিন্তু তার জন্মের এই দুই হাজারেরও বেশি সময় পরে পৃথিবীতে কি আজ শান্তি আছে? মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে কি সত্যিকারের শান্তি বিরাজ করছে? মানুষের মধ্যে কি সমতা, নিশ্চয়তা, একতা, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এবারের বড়দিন-যিশুর জন্মবারতা আমাদের এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করছে।

বড়দিন সার্বিক ভাবে আনন্দের দিন। কিন্তু সবাই কি সমান ভাবে আনন্দ করতে পারে? বড়দিন সবার কাছেই কি আনন্দের উপলক্ষ্য হয়ে আসে? বিশ্ব আজ অস্থির- মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উভয় দুর্যোগের কারণেই। করোনা মহামারি পৃথিবীকে এক সংকটময় পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। ধনী শ্রেণির সম্পদের সেভাবে তারতম্য না হলেও মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির আর্থিক অবস্থার হয়েছে অবনতি অন্যদিকে বিশ্বের প্রায় সমস্ত কিছুরই দাম বাড়ছে। দেশে দেশে যুদ্ধ বিরাজ করছে যা বিশ্বকে আরও অস্থিতিশীল ও সংকটময় করে তুলছে। উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলো জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য লড়াই করছে। এই যে সারা বিশ্বব্যপি একটি সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এর মাঝে এবারের যিশুর জন্মদিন আমাদের জন্য কি বারতা বহন করে আনে! আমরা বৈশ্বিক সংকটগুলো আলোচনা করলেই যিশু সেখানে কি বারতা দেন তা বুঝতে পারবো।

বিজ্ঞানের কল্যাণে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রিত হলেও এর অর্থনৈতিক খেসারত কাটিয়ে উঠার আগেওই ইউক্রেন সংকটে সারা বিশ্ব আজ নতুন এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে একটি অনিবার্য পরিস্থিতির দিকে ধাবিত করছে। রশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের পর বিশ্বজুড়ে যে একটি সংকট উপস্থিত হতে যাচ্ছে এবং অর্থনীতির ওপর আঘাত আসতে পারে সে আঁচ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। ক্ষুধার আগুনে পুড়ছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। যাদের জীবনে দিনে একবারও খাবার জোটে নি, এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। নানা সংকটে এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রতি তিনজন মানুষের একজন এ অনিশ্চয়তার শিকার।

গত কয়েক বছর ধরে করোনা মহামারির প্রভাবে বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার হার উল্লম্ফন ঘটেছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহামারির ১ বছরেই বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষ বেড়েছে ১৮ শতাংশ, যা গত কয়েক দশকে দেখা যায় নি। এদিকে নতুন করে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান এরই মধ্যে একটি ট্রাজেডিতে পরিণত হয়েছে। এটি বিশ্বে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে খাদ্য সংকটের পাশাপাশি আরও কিছু বিপর্যয় ডেকে আনছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর থেকে খাদ্যপণ্য, জ্বালানি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ৭ কোটি মানুষকে অনাহারের কাছাকাছি ঠেলে দিয়েছে। তাই চলতি বছর থেকে বাস্তব অর্থেই একাধিক দুর্ভিক্ষের দেখা দেয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ডব্লিউএফপি বলেছে বর্তমানে খাদ্য পণ্যের দাম নিয়ে যে সংকট চলছে, তা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়ে খাবার না পাওয়ার সংকটে পরিণত হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বে সাড়ে ৩৪ কোটি মানুষ খাদ্য নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তারা ৮২টি দেশের নাগরিক। অনাহারের ঝুঁকিতে থাকা এসব মানুষের মধ্যে ৪৫টি দেশের ৫ কোটি মানুষ চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে বলে জানান ডব্লিউএফপির প্রধান। তিনি বলেন, এত দিন যেটাকে ক্ষুধার স্রোত বলা হচ্ছিল, তা এখন ক্ষুধার সুনামিতে পরিণত হয়েছে (তথ্যসূত্য আলোকিত বাংলাদেশ, ২৫ অক্টোবর ২০২২)।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সারা বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দাবদাহ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উপকূলীয় এলাকায় বন্যা, যা এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের সরকারের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের মূল্যায়নে এই বিষয়গুলো উঠে আসে। ইউরোপ, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বড় অংশে দাবদাহ ক্রমাগত বাড়ছে। একইভাবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ভারী বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়ছে এবং কিছু দিন পরপরই বিশ্বের নানা জায়গায় একই উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে। গেল ২০ বছরে বিশ্বব্যপী জলবায়ু পরিবর্তনের নানা কুফলে মারা যায় ৫ লক্ষ ২৮ হাজারেরও বেশি মানুষ এবং ৩ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর এর সরাসরি ফলাফল হিসেবে আবহাওয়া বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে ১১ হাজারটি।

জাতিসংঘের তথ্য বলছে বিশ্বে প্রায় ২৩০ কোটি মানুষ সুপেয় পানির সংকটে থাকা দেশগুলোতে বসবাস করছে। এমতাবস্থায় জলবায়ু সংকট আরও প্রবল হলে বৈশ্বিক সুপেয় পানির সংকট আরও বহু গুণে বেড়ে যাবে। অতিমাত্রায় উষ্ণতা ও শৈত্যপ্রবাহ দুটোই কৃষির জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ দুটোই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে জলবায়ু অনাকাঙ্খিত এই পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষি উৎপাদন খাত দ্রুত অভিযোজন হতে পারছে না। এজন্য বৈশ্বিক কৃষি উৎপাদন খাত ও বাজার ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিচ্ছে। (তথ্যসূত্র: প্রতিদিনের সংবাদ, সেপ্টেম্বর ২, ২০২২)।

বর্তমান সময়ে জ্বালানি সংকট প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে। ইউরোপের পরিস্থিতি

সবচেয়ে করুণ। এ শীতে অন্ধকারে জমে যাওয়ার আশঙ্কায় আছেন এখানকার অনেক নাগরিক। ডলার আর ইউরোর দাম কাছাকাছি হয়ে যাওয়ায় এখানে তেলের দাম ইউরোতে ২০০৮ ও ২০১২ খ্রিস্টাব্দের মতো হয়ে গেছে। রাশিয়া থেকেও প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ আগের চেয়ে কমে গেছে। আর্জেন্টিনা, ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, জাপান, ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অনেক দেশের মুদ্রার মান ডলারের সাপেক্ষে কমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ও ইউরোজোনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এতসব সমস্যার মাঝেও সুদ হারে লক্ষ্যমাত্রা বাড়াচ্ছে। পণ্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে এভাবে ইন্টারেস্ট রেটও বাড়লে ভোক্তাকে খরচ আরও কমিয়ে দিতে হবে যার ফলে তৈরি হবে মন্দা পরিস্থিতি *(তথ্যসূত্র The Business Standard Bangla, September 1, 2022)।*

অভিবাসী সংকট, শিশু শ্রম ও নির্যাতন, নারী অধিকার আন্দোলন (তুরস্ক), কুটনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শীতল যুদ্ধ, ধর্মীয় মৌলবাদিতা, সিন্ডিকেট, ব্যয় কমানোরা জন্য কর্মী ছাটাই (টুইটার ও মেটা), পারমানবিক বোমা ব্যবহারের ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়গুলো বর্তমানে বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। মানুষ তার অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করছে এবং প্রাণ দিচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে (যুক্তরাষ্ট্র-চীন-রাশিয়া) প্রতিনিয়তই শীতল যুদ্ধ বিরাজ করছে যা যে কোন সময় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। উন্নত দেশগুলো ঋণের ফাঁদে পড়ে ছোট গরিব দেশগুলো দেউলিয়া হওয়ার পথে। এসব বিষয় বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞগণ খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষের বার্তা দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে নানা সংকট প্রতীয়মান হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি মানুষকে নাস্তানাবুদ করছে। কাগজসহ শিক্ষা উপকরণের দাম বৃদ্ধিতে শিক্ষা খাত নিয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ডলার সংকট অর্থনৈতিক মন্দার আভাস দিচ্ছে। সব জিনিসের দাম বাড়লেও কর্মক্ষেত্র বা বেতন ভাতা সেভাবে বাড়ছে না ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সংকটময় পরিস্থিতির।

এই বৈশ্বিক সংকটময় পরিস্থিতির মাঝেই এবার আমরা বড়দিন উৎসব পালন করছি। যিশু আমাদের মাঝে কি বার্তা নিয়ে এসেছেন তা বোঝা এবং সে'মত কাজ করাই হতে পারে আমাদের জন্য এ সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায়। আমাদের হতাশ হলে চলবে না কারণ এরকম পরিস্থিতি যে একদিন আসবে তা যিশু নিজেরই বলেছিলেন, *"এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতি, এক রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্য রাজ্য যুদ্ধ শুরু করে দেবে। নানা জায়গায় দেখা দেবে ভূমিকম্প, দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ (মার্ক ১৩:৮)।"* এরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়ে যিশু আমাদের কি বার্তা দেন তা বুঝতে চেষ্টা করা এবং সেই মত কাজ করতেই যিশু আমাদের আহ্বান করছেন।

১) একতার বার্তা

বিশ্ব আজ বিচ্ছিন্ন। দেশ, জাতি, জনগণ সবাই আজ নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এই বিচ্ছিন্নতাই বহু সংকটের কারণ। এই বিচ্ছিন্নতার মাঝে যিশু একতার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি তার সেই প্রার্থনা পুনরায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, *"আমাকে তুমি যে মহিমা দিয়েছ, তাদের আমি সেই একই মহিমা দিয়েছি, যাতে তারা এক হয়, যেমন আমরা দু'জনেই এক- তাদের মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে তুমি-যাতে তারা সম্পূর্ণই এক হয় (যোহন ১৭:২২-২৩)।"* আমরা বড়দিনে যিশুকে গ্রহণ করি মানেই তার বাণীকেই গ্রহণ করি কারণ বাণীই দেহ গ্রহণ করেছিলেন। যিশু একতার মডেল হিসেবে আমাদের সামনে রাখছেন সেই আদি মণ্ডলীকে যেখানে আমরা দেখি, *"খ্রিস্টবিশ্বাসী-সমাজের সবাই ছিল একমন একপ্রাণ (শিষ্যচরিত ৪:৩২)।"* সুতরাং একতার যে বার্তা যিশু আমাদের তার জন্মের মধ্যদিয়ে দিচ্ছেন তা আজকের সংকটময় বিশ্বে খুবই দরকার।

২) ভালবাসার বার্তা

কবি বলেছেন, "যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা"- যুদ্ধ হল ভালবাসাশূন্যতা। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানেই যুদ্ধ। জগতে আজ প্রকৃত ভালবাসার খুবই অভাব। স্বার্থ ছাড়া আজ কেই কাউকে ভালবাসতে চায় না। ভালবাসাই পারে জগত থেকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে। তাই যিশু আমাদের কাছে বার্তা নিয়ে এসেছেন আমরা যেন অবহেলা, ঘৃণা, হিংসার, প্রতিশোধের মাঝে ছড়িয়ে দিই তাঁর ভালবাসা। যিশু এ জগতে থাকাকালে নিজেই আমাদের আদেশ দিয়েছেন, *"শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছে: তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে! আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে (যোহন ১৩:৩৪)।"* আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, *"তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালইবাসবে (মথি ৫:৪৪)।"* এর মধ্যদিয়ে যিশু ভালবাসাকে সবাই উপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জগতের মানুষ তা ভুলে যাই আর তাই জগতে আজ এত সমস্যা, যুদ্ধ। যিশু পুনরায় আমাদের জন্য আজ ভালবাসার বার্তা নিয়ে এসেছেন।

৩) ধন-সম্পদ সহভাগিতার বার্তা

ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করে তা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন যেন মানুষ তা সদ্ব্যবহার করে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু এই জাগতিক ধন সম্পদ নিয়েই আজ জগতে নানা সমস্যা, যুদ্ধ লেগেই আছে। কোন সম্পদ কার অধিকারে আছে, কিভাবে অন্যের সম্পদ নিজেদের অধিকারে আনা যায় এগুলো নিয়েই জগতের মানুষ ব্যস্ত। আধ্যাত্মিক ধন সম্পদের পেছনে খুব বেশি মানুষ ছুটছে না। তাই এই ধন সম্পদকে কেন্দ্র করেই সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এই ধন-সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জগতের সকল মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব। যিশু আমাদের আজ সেই বার্তাই দিচ্ছেন। ধন সম্পদের প্রতি আসক্তি ছিল না বলেই আদি মণ্ডলী শান্তিতে জীবন-যাপন করত, *"তাদের কেউই নিজের কোন সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করত না, সব-কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি (শিষ্যচরিত ৪:৩২খ)।"* যিশু আজ আমাদের সেই আদি মণ্ডলীর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট সব সম্পদ সবার সঙ্গে সহভাগিতার আহ্বান জানাচ্ছেন।

৪) খাবার সহভাগিতার বার্তা

যিশু যখন মানুষকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছেন তখন তিঁনি নিজেই তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, *"না, ওদের কোথাও যেতে হবে না! তোমরা নিজেরাই বরং ওদের খেতে দাও (মথি ১৪:১৬)।"* অথচ আজ বিশ্বে মানুষ একদিকে না খেয়ে মারা যাচ্ছে অপরদিকে কেই খাবার নষ্ট করছে। কেন এই ভেদাভেদ। যিশু কি এটাই দেখতে চেয়েছিলেন? যিশু চান না কেউ এই জগতে না খেয়ে মারা যাক। জগতে যে খাবার আছে তা যদি সুষ্ঠু বন্টন ও সরবরাহ করা যায় তাহলে কেউ না খেয়ে থাকবে না। তাই যিশু আমাদের বলছেন আমরা যেন আমাদের খাবার

সহভাগিতা করি যেমনটি করত সেই আদি মণ্ডলী, *"তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত (শিষ্যচরিত ২:৪৬খ)।"*

৫) বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার বার্তা

"সেদিন মানবপুত্র ফিরে আসবে, তখন সে কি পৃথিবীতে একটুও ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখতে পারে? (লুক ১৮:৮খ)।" বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বাসের বড়ই অভাব। মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখছে না মানুষেও বিশ্বাস রাখতে পারছে না। যার ফলে ঈশ্বরে-মানুষে ও মানুষে-মানুষে বেড়েছে দূরত্ব। তাই অন্যের জন্য দরদ হারিয়ে যাচ্ছে ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যার। যিশু আমাদের এবার বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার বার্তা নিয়ে এসেছেন। আমদের বলছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে, তিঁনিই আমাদের সব সমস্যার ভার বইবেন। আমাদের ঈশ্বরে ভরসা রাখতে হবে এবং আমাদের সমস্যার কথা তাকে বলতে হবে। যিশু বলেছেন, *"তোমরা যদি আমার নাম স্মরণ করে আমারই কাছে থেকে কোন-কিছু চাও, আমি তোমাদের তা দেবই (যোহন ১৪:১৪)।"* তাই যিশু আমাদের বার্তা দিচ্ছেন বিশ্বাসে বলীয়ান হতে।

৬) আদর্শ নেতা হওয়ার বার্তা

বর্তমানে বিশ্বে সংকটময় পরিস্থিতির অন্যতম কারণ হল আদর্শ নেতার অভাব। নেতা হওয়ার অর্থ এই নয় কর্তৃত্ব করা বরং কিভাবে জনগণকে সঠিক পথ দেখানো যায়, কিভাবে ভবিষ্যতের সমস্যা সুষ্ঠু ভাবে মোকাবেলা করা যায়, জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায়। যিশু ছিলেন একজন আদর্শ নেতা যিনি অধিকারের সুরে কথা বলতেন এবং সাধারণ মানুষ তার কথা তন্ময় হয়ে শুনত। তার মতো নেতা আজ খুবই প্রয়োজন যে সেবার আদর্শ নিয়ে মানুষকে পরিচালিত করবে, কর্তৃত্বের বা শাসনের আদর্শ নিয়ে নয়। যিশু বলেছেন, *"কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাহলে সে যেন সকলের শেষেই থাকে, সে যেন সকলেরই সেবক হয় (মার্ক ৯:৩৫)।"* তাই নেতা হওয়া হল জনগণের সেবক হওয়া, নিজেকে জনগণের কাতারে নামিয়ে আনা। কিন্তু আজকের বিশ্বের নেতারা থাকেন জনগণ হতে দূরে, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুবিধা নিয়ে। সাধারণ জনগণের অভাব অনেক সময় তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। তাই যিশুর জন্মবারতা সেই সব নেতাদের জন্য তারা যেন মঙ্গলসমাচারের আলোকে আদর্শ নেতা হয়ে জনগণকে পরিচালিত করে।

৭) পার্থিব বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা না করার বার্তা

জাগতিক ধন সম্পদ, আরাম আয়েস নিয়ে জগতের মানুষ আজ খুবই চিন্তিত। ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য খাবার-দারার, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ জমা করে রাখছে। ধনী দেশগুলো ভবিষ্যতের জন্য নানা সম্পদ জমা করে রাখছে। এর কারণে একদিকে যেমন সম্পদের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না অন্যদিকে অন্য মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু যিশু বলেছেন ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের হাতেই ছেড়ে দিতে। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের পালনও করবেন। যিশু বলেছেন, *"আকাশের পাখীদের দিকে একবার চেয়ে দেখ: কই, তারা তো বীজ বোনে না, ফসলও কাটে না, গোলাবাড়িতে ফসল জমিয়েও রাখে না; তবুও তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের তো খাইয়ে থাকেন! তোমাদের মূল্য কি তাদের চেয়ে বেশী নয়! বল, তোমাদের মধ্যে কেই বা দুশ্চিন্তা করে নিজের আয়ু এতটুকুও বাড়াতে পারে? (মথি ৬:২৬-২৭)।"* তাই যিশু আমাদের এই বার্তা দিচ্ছেন আমরা যেন ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করে বরং বিশ্বাসে বলিয়ান থাকি।

৮) যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকার বার্তা

আমরা জগতে যত পরিশ্রমই করি না কেন সবই বিফলে যায় যখন আমরা যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি না। অনেক ধন সম্পদ থাকা সত্বেও আমাদের মনে শান্তি থাকে না কারণ সেই পরম শান্তিদাতাকে আমরা ভুলে যাই। কিন্তু আমরা যদি যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি তাহলে এক বেলা খেয়েও আমাদের মনে পরিবারে শান্তি বিরাজ করে। তাই যিশু বলেছেন, *"আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা হলে শাখাপ্রশাখা। যে আমার মধ্যে থাকে আর আমি যার মধ্যে থাকি, সে-ই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না (যোহন ১৫:৫)।"* তাই যিশু আমাদের বলছেন আমরা যেন সর্বদা যিশুর সাথে যুক্ত থাকি তাহলেই আমরা সব কাজে সফল হব। আর যিশুর সাথে যুক্ত থাকা মানেই হল মানুষের সাথে যুক্ত থাকা।

৯) উদার দয়ালু হওয়ার বার্তা

অষ্টকল্যাণ বাণীতে যিশু বলেছেন, *"দয়ালু যারা ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে (মথি ৫:৭)।"* আমরা কি আজ দয়াবান? মানুষের অভাবে কি আমরা পাশে দাঁড়াই? আমরা যদি আজ অন্যের প্রতি দয়া না করি তাহলে ঈশ্বর আমাদের কিভাবে দয়া করবেন। আমরা তো প্রতিনিয়তই ঈশ্বরের দয়ায় বাস করছি, তাহলে আমাদেরও কি উচিত নয় অন্যের প্রতি দয়া দেখানো, অন্যের অভাবে পাশে দাঁড়ানো? এভাবে যদি আমরা দয়ার মনোভাব নিয়ে একে অন্যের পাশে দাঁড়াই তাহলে যে কোন সংকটই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো। তাই যিশু বলছেন আমরা যেন উদার দয়ালু মানুষ হই।

১০) বিনম্র সেবক হওয়ার বার্তা

বৈশ্বিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের বিনম্র সেবক হওয়া খুবই জরুরি। বিনম্র সেবকের কাছে উচুঁ-নিচু ধনী-গরীব ভেদাভেদ নেই। তার কাছে কেউ শত্রু নয় সবাই বন্ধু। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। কেই যদি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলেই আমরা তাদের শত্রু ভাবতে শুরু করি এবং সেভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করি। দয়া দেখানে তো দূরের কথা প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজি। কিন্তু যিশু বলেছেন, *"তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তোমরা তাদের শুভ কামনা কর; যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর (লুক ৬:২৭-২৮)।"* যিশুর এ বাণী যদি আমরা পালন করে চলে তাহলে আমাদের কোন শত্রু থাকবে না জগতে কোন যুদ্ধ বিরাজ করবে না। গোট জগত শান্তিতে বাস করবে। তাই যিশু আজ আমাদের বিনম্র সেবক হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন।

১১) আত্মত্যাগী হওয়ার বার্তা

জগতের মানুষ আজ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ধন সম্পদ আহরণের প্রতি বেশি মনোযোগী। ঘুষ, মাদক, খুন, লুটপাট ইত্যাদির বিনিময়ে হলেও মানুষ তা থেকে পিছিয়ে আসে না। কিন্তু এ ধনসম্পদ যে অস্থায়ী তা তারা চিন্তা করে দেখে না। কারণ যিশু বলেছেন, *"সারা জগৎকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজেরই*

সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলে, তাতে তার কী-ই বা লাভ হতে পারে? (মথি ১৬:২৬)।" তাই আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য সম্পদ আহরণ করা দরকার যা সম্ভব কেবল নিজের আমিত্ব থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যদিয়ে। অর্থাৎ সমাজের মানুষের সার্বিক চিন্তা করতে হবে। অন্যের ভালোর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন সমাজের/দেশের সংকট সমাধান হবে অপরদিকে নিজের জন্যও শাশ্বত জীবন নিশ্চিত হবে। তাই যিশু আজ আমাদের বলছেন আমরা যেন আত্মত্যাগী হই, সবার ভালোর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিই।

১২) প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার বার্তা

প্রকৃতি আজ বড়ই বিরূপ। সবসময়ই বিশ্বের কোথাও না কোথাও কোন না কোন দুর্যোগ লেগেই আছে। এর কারণ আমরাই। আমাদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি যার কারণে আজ এ অবস্থা। কথায় আছে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপের ক্ষমা আছে, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপের ক্ষমা নাই। প্রকৃতি তার আপন নিয়মে প্রতিশোধ নেন। আদি পুস্তকে দেখি ঈশ্বর তার মনের মাধুর্য মিশিয়ে এই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রশংসাও করেছে। ঈশ্বর তা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে তাকে যত্ন করতে তাকে ধ্বংস করতে নয়। কিন্তু আমরা আজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি। যার ফলে আমরা নানা সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি প্রতিনিয়তই। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, শৈত্যপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, দাবদাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো বিশ্বকে আরও সংকটময় করে তুলছে। তাই যিশু আমাদের বলছেন আমরা যেন ঈশ্বরের সৃষ্ট এই প্রকৃতির যত্ন নেই তাহলে প্রকৃতি যেমন আমাদের রক্ষা করবে তেমনি বিশ্বও সংকট থেকে মুক্তি পাবে।

১৩) পবিত্র আত্মার পরিচালনায় পরিচালিত হওয়ার বার্তা

মানুষ হিসেবে আমরা দুর্বল। তাই প্রতিনিয়তই আমরা প্রলোভনে পড়ি। কিন্তু আমরা যদি পবিত্র আত্মার পরিচালনায় নিজেদের সঁপে দেই তাহলে আমরা সঠিক পথে চলতে পারি আর ঈশ্বর আমাদের সকল বোঝা বহন করেন। কারণ পবিত্র আত্মা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের পরিচালিত করেন, *"আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মাই তো আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন (রোমীয় ৮:২৬)।"* কিন্তু যখন পবিত্র আত্মাকে বাদ দিয়ে নিজেদের উপর ভরসা রাখি, তখনই আমরা নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ি। যে সমস্যা আমাদের সংকটের দিকে ধাবিত করে-ব্যক্তিগত সংকট থেকে সামাজিক সংকট, সামাজিক সংকট থেকে সর্বজনীন সংকট। তাই যিশু চান তিঁনি যে সহায়ক আত্মাকে রেখে গেছেন, আমরা যেন তার পরিচালনায় জীবন-যাপন করি।

১৪) সর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকার বার্তা

সর্বোপরি যিশু আমাদের সর্বদা সজাগ সতর্ক থাকতে বলছেন কারণ *"সে মহালগ্ন যে কখন আসবে, তোমরা তো সে কথা জানো না (মার্ক ১৩:৩৩)।"* আমরা যদি জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি আর সেই মহালগ্ন যদি এসে যায় তাহলে আমাদেরই এই জাগতিকতা আমাদের বাঁচাতে পারবে না। তাই সেই মহাদিনের জন্য আমাদের নিজেদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যিশু এবার তাঁর জন্মতিথিতে আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

যিশু চান না আমরা ধ্বংস হই বা নরকে নিক্ষিপ্ত হই, *"তিঁনি তো চান না যে, কেউ বিনষ্ট হয় (২ পিতর ৩:৯)।"* তিঁনি চান যেন আমরা সর্বদা জীবিত থাকি এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকি। তার কাছে সব মানুষই সমান: ধনী-গরীব, উচুঁ-নিচু, বোকা-বুদ্ধিমান, সাদা-কালো ইত্যাদির কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু আমরা জগতের মানুষরাই সেই ভেদাভেদ সৃষ্টি করে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং নানা রকম সংকট ডেকে আনি যা আমাদের অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। যিশু সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে গিয়ে আমাদের অন্তরে জন্ম নিতে চান। তিনি চান জগতের মানুষ যেন পারস্পরিক সহভাগিতার মধ্যদিয়ে সকল সংকট জয় করে এবং এভাবেই গড়ে তোলে শান্তিময় বিশ্ব। তাই আসুন আমরা মুক্তিদাতা যিশুর আগমন বার্তা গ্রহণ করে সেই মত জীবন-যাপন করি এবং গড়ে তুলি সংকটময় বিশ্ব।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীষ্টিয়াঁ মিংগো, এস. জে অনুবাদিত: 'মঙ্গলবার্তা', প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ১০১১॥

বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিতে বড়দিন...

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান-কীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদি। সব মিলে এক মহোৎসব। বাংলাদেশের খ্রিস্টানগণ চেষ্টা করেন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আচার অনুযায়ী বড়দিনের এসব অনুষ্ঠান করতে। দিনে দিনে এই আনন্দ উৎসবের মাত্রা ও ব্যাপ্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের সাধ্যমত ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে, কাগজের ফুল, জরি, বেলুন, কর্কসিট ও ক্রিস্টমাস ট্রি দিয়ে সাধারণত বাড়ী ঘর সাজিয়ে থাকেন। বর্তমানে গির্জাঘরের পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই গোশালা তৈরী করা হয়। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই বড়দিনের কেনাকাটা শুরু হয়ে যায়। ধনী গরীব সব খ্রিস্টানই বড়দিনের জামাকাপড়, জুতো, প্রসাধনীর সামগ্রী কিনে থাকেন।

যুবক-যুবতীরা যখন বড়দিনের গান, কীর্তন, সখী কীর্তন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন মা বোনেরা নানা রকমের পিঠা তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাবারা ব্যস্ত থাকেন কেক তৈরীর কাজে। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করেই বড়দিন পালন করা হয়। পারিপার্শ্বিক কারণে মধ্য রাতের খ্রিস্টযাগ হয় এখন সন্ধ্যাবেলায়। সবাই নতুন জামা কাপড় জুতো পরে শীতকে ঠেলে ফেলে দলে দলে গির্জায় উপাসনার জন্য সমবেত হয়। সকলকেই বেশ পরিপাটি সাজগোজে দেখা যায়। মেয়েদের সাজগোজে থাকে আলাদা মাত্রা, আমেজ। ২৪ তারিখ সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে খ্রিস্টযাগের পরে শুরু হয় করমর্দন, কোলাকুলি, পদধূলি গ্রহণ। সকলে সকলের সঙ্গে বিনিময় করেন– শুভ বড়দিন। পরে বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া। সব ধর্মের মানুষই বড়দিনে আনন্দ উৎসবে যোগদান করে থাকেন।

এবারের বড়দিন বাংলার আবহমান সংস্কৃতির মাধুর্যে দিন দিন আরও আনন্দমূখর হয়ে উঠুক। বাংলার ঘরে ঘরে বয়ে যাক অনাবিল আনন্দধারা। নবজাত শিশু যিশুর প্রেমাশীর্বাদ সবার অন্তরে নেমে আসুক। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করুক। শুভ বড়দিন॥

রাখালদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ

ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও

শিশুযিশু কখন, কাদের কাছে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন? রাখালদের কাছে? না-কী প্রাচ্য দেশের পণ্ডিতদের কাছে? খ্রিস্টীয় উপাসনা বছরের রোমান পঞ্জিকা অনুসারে বড়দিনের দ্বিতীয় রোববার যিশুখ্রিস্টের আত্মপ্রকাশ পর্ব পালন করা হয়। আমরা স্মরণ করি প্রাচ্য দেশের তিনজন জ্যোর্তিবিদ পণ্ডিত আকাশে একটি বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে তাদের গণনায় নিশ্চিত হয়েছিলেন- কোথায় এবং কখন খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করবেন। আর সেই নক্ষত্রটি আকাশে উদয় দেখে যিশুকে দেখার জন্যই বেরিয়ে পড়েছিলেন বেথলেহেম নগরীর উদ্দেশ্যে। ইতিহাসবিদদের মতে, এই তিন পণ্ডিতের নাম হলো- গাসপার, মেলখিয়র এবং বালথাসার। *"বাড়িতে ঢুকে তাঁরা শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার কোলে দেখতে পেলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিলেন সোনা, ধুপধুনা, ও গন্ধনির্যাস (মথি ২:১১)।"* যার অর্থ দাঁড়ায়- রাজগরিমা, মহাযাজকত্ব এবং মৃত্যুলোক।

কিন্তু প্রান্তরের রাখালগণ তো যিশুর জন্মের পর পরই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন *(লুক ২:৮-২০)*। রাখালদের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন স্বর্গদূতগণ আর পণ্ডিতগণদের সন্ধান দিয়েছিলেন আকাশের নক্ষত্র। রাখালগণ যিশুর জন্ম সংবাদ সর্বপ্রথম স্বর্গদূতদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আর তারাই সর্বপ্রথম মুক্তিদাতা জন্মের খবরটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। *"এই রাখালদের কথা যারা শুনল, তারা সকলে অবাক হয়ে গেল... রাখালেরা যা কিছু শুনল ও দেখল, তার জন্যে পরমেশ্বরের বন্দনা করতে করতে, তাঁর জয়গান গাইতে গাইতে তখন ফিরে গেল (লুক ২:১৮-২০)।"* এইভাবে মাঠের এই মেষপালকগণ হয়ে উঠলেন উত্তম মেষ পালকের প্রথম প্রচারক।

রাখালদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ একটি বিস্ময়ভরা ঘটনা। সেদিন গভীর রাতে স্বর্গদূতেরা কী করেছিলেন? কেনো দূতগণ রাজপ্রাসাদে গিয়ে যিশুর জন্মের বার্তাটি দেননি? রাজপ্রাসাদের প্রহরীগণই কী জেগে ছিলেন না? হয়তো বা অনেকে জেগে ছিলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের কেউ কী বিশ্বাস করতেন যে, যিনি বিশ্বের মুক্তিদাতা, তাঁর জন্ম হয়েছে গোয়াল ঘরে। যারা রাজপ্রাসাদে থাকেন, তারা তো রাজপ্রাসাদের খবরই রাখেন। তাদের যতোসব অভিজ্ঞতা রাজপ্রাসাদকে ঘিরেই। আর যখন রাজপ্রাসাদ থেকে তূরীধ্বনি ভেসে আসে প্রজাগণ ধরে নেন কোনো রাজকুমারের জন্ম হয়েছে- যিনি একদিন তাদের রাজা হবেন, শাসন করবেন। অন্যদিকে গোয়াল ঘরের অভিজ্ঞতা রাখালরাই ভালো জানেন। গোয়াল ঘরের প্রতিটি অংশই তাদের জানা। স্বর্গদূত যদি রাখালদের বলতেন- রাজপ্রাসাদে তোমাদের মুক্তিরাজ জন্মেছেন তোমরা তাঁকে গিয়ে দেখে এসো। রাখালগণ কখনোই যেতেন না রাজপ্রাসাদে। সেখানে যেতে কতো বাধা, সব কিছু অপরিচিত। কারণ গরু-ভেড়া আর গোয়াল ঘর ঘিরেই তাদের জীবন-যাত্রা। নিজেদের পরিবেশটা নিজেদের কাছেই বেশি বড় এবং পরিচিত। রাখালগণ কিন্তু স্বর্গদূতদের দেখে পালিয়ে যাননি- হয়তো বা ভয় পেয়েছিলেন *(লুক ২:১০)*। তারা স্বর্গদূতদের এই বিষয়ে কোনো প্রশ্নও করেননি। তাদের মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি। স্বর্গদূতগণ এই খবরটি যদি কোনো রাজপ্রাসাদে দিতেন, তাহলে সম্ভবত কেউ বিশ্বাস করতেন না। তারা নিজেরা বলাবলি করতেন, গোয়াল ঘরে রাজাধিরাজের কীভাবে জন্ম হয়? আর রাখালগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে বললেন *"চল, এখন আমরা বেথলেহেমে যাই, সেখানে যা ঘটেছে বলে প্রভু আমাদের জানিয়েছেন, তা একবার দেখে আসি (লুক ২:১৫)।"*

মাঠের রাখালগণ অবশ্যই জানতেন পৃথিবীতে একজন শান্তিদাতার আগমন ঘটবে। আর স্বর্গদূতেরা তো এই বার্তাটিই গেয়ে শুনালেন, *"জয় উর্দ্ধলোকে পরমেশ্বরের জয়, ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে (লুক ২:১৪)।"* তাই তাদের বিনম্র অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন, দ্বিধা করেননি বেথলেহেম যেতে।

স্বর্গদূত সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত কতোদূর উড়েছিলেন? আমরা কল্পনা করতে পারি- তারা সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত প্রান্তর থেকে প্রান্তরে উড়েছিলেন। খুঁজে দেখেছেন এমন কেউ কী জেগে আছেন- যাকে মুক্তিদাতার জন্মের খবরটি দিতে পারেন। রাজপ্রাসাদ, মন্দিরে কোথায়ও একজনকে পাওয়া যায়নি- যিনি জেগে আছেন, তাঁর অপেক্ষায় আছেন। শুধু জেগে ছিলো প্রান্তরের রাখালগণ। তারা রাত জেগে গরু-ভেড়াগুলো পাহারা দিচ্ছিলেন। রাখালগণ যখন বেথলেহেমের গোয়াল ঘরে গেলেন- দেখতে পেলেন মা মারীয়া ও যোসেফ শিশুটিকে ঘিরে জেগে আছেন। *"এদিকে মারীয়া এই সমস্ত কথা অন্তরে গেঁথে রেখে তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন (লুক ২:১৯)।"* তাহলে মারীয়া কী আগেই জানতেন এমনটি ঘটবে? নয়তো-বা তিনি যুদেয়ার প্রান্তরে কেনো সেই গীত গেয়েছিলেন *"গর্বিত-হৃদয় যারা, তাদের তিনি চারদিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। যত নৃপতিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনেছেন আর দীন মানুষকে তিনি বসিয়েছেন উচ্চ আসনে (লুক ১:৫১-৫২)।"* আর স্বল্পভাষী যোসেফ শিশুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হয়তো ভাবছিলেন, মারীয়া আসলেই পবিত্রাত্মার শক্তিতে আচ্ছাদিত হয়েছিলেন। তার মনে পড়লো সেই কথা, *"মারীয়ার দুর্নাম করতে না চেয়ে তিনি তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন (মথি ১:১৯)।"* রাখালরা যোসেফের ভুল ভেঙ্গে দিলেন। তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন। এবার মনে পড়লো স্বপ্নের কথা, *"সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে, তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু, কারণ তিনিই আপন জাতির মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন (মথি ১:২১)।"*

ঈশ্বর মারীয়ার মধ্যদিয়ে একটি অসীম কর্ম সাধন করলেন এবং পুরাতন যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করলেন। খ্রিস্ট মণ্ডলী মারীয়াকে যিশুর মা হিসেবেই সম্মান করে থাকে। ইহুদি জাতির প্রত্যাশানুসারে তিনি হলেন আশার চিহ্নস্বরূপ। অন্যদিকে খ্রিস্টানদের কাছে তিঁনি হলেন মণ্ডলীস্বরূপ যিনি যিশুকে ধারণ করেছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহন এবং প্রেরিতশিষ্যদের মত মঙ্গলসমাচার প্রচার মারীয়ার কাজ ছিলো না। কিন্তু যিশুর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল *(লুক ৮:১৯-২১)*। এই বিশেষ ভূমিকার মধ্যে তাঁর গোটা সত্তা নিহিত ছিল। মারীয়া ছিলেন এমন একজন, যিনি "বিশ্বাস করেছিলেন।" যেমন সাধু লুক লিখেছেন, *"আহা, ধন্যা সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভুর নামে তাঁকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে (১:৪৫)।"* অন্য কথায় মারীয়া খ্রিস্টকে গর্ভে ধারণ করার পূর্বে অন্তরে ধারণ করেছিলেন। তাঁর আগমন মানুষের রক্ত মাংস ও ইচ্ছার কারণে নয়-একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

এই বড়দিনে মুক্তিদাতাকে দেখার জন্য আমি কী জেগে থাকবো? স্বর্গদূত কী আমার কাছে এসে বলবেন, *"ভয় পেয়ো না, আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি। এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দায়ুদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন- তিনি সেই খ্রিস্ট স্বয়ং প্রভু (লুক ২:১০-১১)।"* মাঠের রাখালগণ আমাদের আদর্শ। তারা স্বর্গদূতের কথায় বিনাবাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন। তারা নিজেদের সাজানো গোয়াল ঘরেই যিশুকে দেখতে গিয়েছিলেন। আমরা যদি আমাদের অন্তরকে নিজেদের ঘর হিসেবে সাজিয়ে তুলি, তাহলে মুক্তিদাতাকে আমাদের দেহ মন্দিরেই দেখতে পাবো। যাবপাত্রে শুয়ে তিঁনি আমার অপেক্ষায় আছেন। সবার প্রতি রইলো বড়দিনের শুভেচ্ছা। আর নববর্ষ বয়ে আনুক সবার জীবনে নব প্রাণশক্তি॥

বড়দিন: ভালবাসার জন্মদিন

সিস্টার ড. মেরী হেনরিয়েটা এসএমআরএ

প্রতিবছর আমরা বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করছি আর প্রতিবছরই দিনটিকে আমরা নতুনরূপে উপলব্ধি করে থাকি, বিশেষ কোন সংবাদ এ বড়দিন উৎসব থেকে আমরা পাই যা আমাদের দান করে চলার পথে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি, দান করে আধ্যাত্মিক পাথেয় যার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনকে নতুনরূপে দেখার অনুপ্রেরণা লাভ করি। আর তাই এবছর বড়দিনের কথা মনে পড়তেই আমার হৃদয়ে যেন এ কথাগুলো অনুরণিত হলো- বড়দিন-এ যে ভালবাসার জন্মদিন, ভালবাসার দিন, ভালবাসা বিনিময়ের দিন, ভালবাসায় স্নাত ও পরিপ্লুত হওয়ার দিন।

ভালবাসায় যার আবাস, যার অবস্থান ও স্থিতি, সেই ঈশ্বর তো একান্তই প্রেমস্বরূপ। আর তিনি প্রেমস্বরুপ বলেই তার ভালবাসায় তিনি আমাদের আগলে রেখেছেন সদা সর্বদা। কীভাবে তা সম্ভব হচ্ছে? হ্যাঁ একমাত্র তার ভালবাসার কারণে তিঁনি আমাদের জন্য মানুষ হলেন– জন্ম নিলেন নারী গর্ভে। মানবের সাথে মিশে তিনি হয়ে গেলেন একাকার, তাই জন্ম হলো ভালবাসার। কেননা স্বর্গ ও মর্তের যে মিলন মেলা তা যে শুধুই ভালবাসার কারণে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা হয়েও তিনি যে কোন ব্যবধান রাখেননি আমাদের সাথে। আর তাই তিনি আজ স্থান করে নিলেন আমাদের হৃদয়ে। বড়দিনের এ শুভ সময়টি সত্যই স্বর্গীয় ভালবাসার সময়। এ সময়টি একটি বিচিত্র আশ্চর্যের সময় যখন আমাদের হৃদয় থাকে স্বর্গীয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ এবং অন্তর গভীরে যিশুকে নিয়ে ভালবাসার অভিজ্ঞতা করার একটি সুবর্ণ সময় ও সুযোগ। ইটি সালিভান বলেছেন, "যখন ঈশ্বর চাইলেন পৃথিবীতে একটি মহৎ কাজ করতে তখন তিনি অতি সাধারণ একটি উপায়ে তা করলেন। তিনি অসহায় দরিদ্রবেশে একজন শিশু হয়ে জন্ম নিলেন। তাই জন্ম হলো ভালবাসার।

আমরা দেখি তিনি আমাদের মাঝে তার পার্থিব ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে আসেননি। এসেছেন অসহায় শিশু হয়ে। আর তাইতো তিনি জন্ম নিলেন গোয়ালঘরে যাবপাত্রে। তার দ্বারা এবং তার মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে ভালবাসার জন্ম হলো আর সেজন্য আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী সবাই তার ভালবাসার সন্তান। তিনি এ পৃথিবীর রাজা হয়েও তার জন্মের স্থান সহভাগিতা করেছেন গোয়াল ঘরে অন্যান্য পশুদের সাথে এবং হয়েছেন আমাদের সর্বমানবের পরিত্রাতা। তার প্রথম সাক্ষাৎকারীরা ছিল বিনয়ী, নম্র, সহজ-সরল রাখালেরা। তার জন্মের ঘটনাকে ঘিরে আজ আমাদের মনে অনেক কিছুই আছে গভীরভাবে চিন্তা ও তা নিয়ে ধ্যান করার।

বড়দিনের সবচেয়ে বড় গল্প হলো ভালবাসার গল্প যা আমরা উপলব্ধি করি। প্রথমেই আমরা অনুভব করি স্বর্গীয় পিতার ভালবাসা তার সন্তানদের জন্য। "তিনি জগতকে এতই ভালবাসলেন যে... পাঠালেন *(যোহন ৩:১৬)*।" এখানেই ঈশ্বরের ভালবাসার চরম ও মূর্ত প্রকাশ আমাদের জন্য।" তাই ঈশ্বরের ভালবাসা এভাবেই আজ প্রকাশ পেয়েছে আর তা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, মহৎ ও শক্তিশালী ভালবাসারূপে এবং আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎস হিসেবে। ভালবাসার শক্তি এবং ভালবাসায় অবস্থান করার সর্ববৃহৎ ক্ষমতা এ বড়দিনে আমরা তা উপলব্ধি করি। আর তাই আমরা দেখি বড়দিনে ঈশ্বর ও মানুষে মিলন এবং মানুষে মানুষে মিলন যার চরম বহি:প্রকাশ হলো ভালবাসা।

ঈশ্বর নিজে যেমন ভালবাসা হয়ে এ পৃথিবীতে নেমে আসলেন তেমনি তিনি আমাদেরকেও পৃথিবীতে ভালবাসার মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করলেন। তাই বড়দিনের আধ্যাত্মিক শক্তি হলো খ্রিস্টের ভালবাসার শক্তি। আর এ শক্তিকে অর্থাৎ বড়দিনের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভালবাসাকে বাড়াতে হলে আমাদের ভালবাসার হাত পৌঁছে দিতে হবে তাদের প্রতি যারা পড়ে আছে অন্ধকারে আছে অনাহারে, অজ্ঞানতায় ও অসুস্থতায়। তাদের জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় উপহার হবে শুধু বস্তুগত জিনিস দেয়া নয়, কিন্তু তাদের কথা হৃদয় দিয়ে শুনা, তাদের প্রতি সহনশীল ও দয়ালু হওয়া, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদেরকে সময় দেয়া। আর এর মধ্যেদিয়েই প্রকাশ পায় আমাদের আশপাশে যারা রয়েছে তাদের প্রতি আমাদের স্বর্গীয় ভালবাসার বহি:প্রকাশ। আর এর মধ্যদিয়েই বড়দিনের প্রকৃত ভালবাসার পরিস্ফুটন ঘটবে। ভালবাসা আমাদের মাঝে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

যিশু যিনি হলেন রাজাধিরাজ, আমাদের পরিত্রাতা, জগতের আলো ও মুক্তিদাতা, আমাদের একমাত্র আশা, ও আশ্রয় এবং আমাদের জীবন তারই ভালবাসায় আজ আমাদের পূর্ণ হওয়ার দিন। তাই আমরা তা ধ্যানময় অন্তরে অনুভব করি নির্মল আনন্দ এবং অন্যকে স্বর্গীয় ভালবাসায় আপন করে নেয়ার তাগিদ। বড়দিনের এ সময়টি সত্যই আমাদের জন্য অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও আনন্দের। আর তাই এ সময় আমাদের আনন্দের অশ্রুও বের হয় আমাদের হৃদয় থেকে এ কথা স্মরণ করে যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য কত বড় ভালবাসার কাজ সাধন করেছেন-ভালবাসা হয়ে আমাদের মধ্যে জন্ম নিলেন, যে ভালবাসার শেষ নেই।

তাই এ বড়দিনের সত্যিকারের আনন্দ হবে যিশুকে আমাদের চিন্তা চেতনায় ও হৃদয়ে রাখা এবং তার আদর্শ অনুসরণ করা। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারি তার ভালবাসার দৃষ্টান্তে জীবন-যাপন করা এবং অন্যদের সেবায় নিজের জীবনকে ব্যয়িত করা। অর্থাৎ এই বড়দিনের সময়টি হলো অত্যন্ত সুন্দর ও উপযুক্ত একটি সময় আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে শিশু যিশুর ভালবাসায় নবীকরণ করার এবং আমাদের হৃদয়কে তার ভালবাসায় উদ্দীপিত করে খ্রিস্টীয় প্রেম ও সেবায় আত্মনিয়োগ করার। বিশেষভাবে আর্ত-পীড়িত, অবহেলিত, বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের নিকট প্রভুর ভালবাসা প্রকাশ করি কেননা বড়দিন হলো পাওয়া নয়, দেয়া। যে অন্যকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে সে অনেক দেয়, যে সময় দান করে সে আরও বেশি দেয় কিন্তু যে নিজেকে দান করে সে সম্পূর্ণ খ্রিস্টের সেবায় জীবনকে উজাড় করে বিলিয়ে দেয়।

প্রকাশিত বাক্য ৩: ২০ এ যিশু আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, দেখ আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি ও আঘাত করছি কেউ যদি আমার স্বর শুনে ও দ্বার খুলে দেয় তাহলে আমি তার সাথে বাস করব এবং সেও বাস করবে আমার মধ্যে। শিশু যিশু যিনি অপেক্ষমান- আমরা কখন আমাদের হৃদয় দ্বার খুলে দেব অর্থাৎ হৃদয় গোশালা খুলে দেব কেননা তিনি যে আমাদের মধ্যে ভালবাসা হয়ে জন্ম নেবেন এবং আমাদের ভালবাসার মানুষ রুপে গড়ে তুলবেন। আসুন সেই ভালবাসার মিলনে আমরা এগিয়ে যাই আমাদের হৃদয়রাজ খ্রিস্টের কাছে। তাহলে তিনি আমাদের তার ভালবাসা ও শান্তিতে প্লাবিত করবেন। কারণ তিনি নিজেই যে ভালবাসা ও শান্তিরাজ।

তথ্যসূত্র:

1. Holy Bible.
2. Article:"Christmas is Chrisllite love"- by Sister Bonnie L. Oscarson.
3. Article: "Christmas is love"-by Thomas S. Monson.
4. Article: Christmas is a celebration of love and sharing by By Rev. Fr. John Damian Adizie (December 23, 2018).
5. Self-reflection.

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ভালোবাসা ও সেবা কাজের নিদর্শনে কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ☐ কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। কারিতাস ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ভোলা ঘূর্ণিঝড়ের পরে Chittagong Organization for Relief and Development (CORD) নামে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ১৮৬০ এ নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছর যাবৎ এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির সাথে সমন্বয় করে কারিতাস বাংলাদেশ এর ছয়টি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। কারিতাসের ছয়টি অগ্রাধিকার হচ্ছে ১) বিপন্ন-জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজকল্যাণ; ২) প্রতিবেশগত সংরক্ষণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা; ৩) শিক্ষা এবং শিশু উন্নয়ন; ৪) পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা; ৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৬) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন। কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে এর ছয়টি অগ্রাধিকারের আওতায় ৯১টি প্রকল্প ও তিনটি ট্রাস্টের মাধ্যমে নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্প নিম্নরূপ,

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কারিতাস বাংলাদেশ এর কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যতম দেশ হলো বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে কৃষি জমি দূষিত হচ্ছে এবং কৃষি কাজের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। এ কারণে সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠী অন্যত্র স্থানান্তর হতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে দ্রুতগতিতে শহরায়ন হচ্ছে এবং বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১১% ভূমি সমুদ্রের পানির নিচে তলিয়ে যাবে, প্রতি সাত জনে এক জন তাদের নিজ জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর হবে এবং ৬৮.৩ মিলিয়ন মানুষ বিশুদ্ধ পানি হতে বঞ্চিত হবে। এই সকল জলবায়ু বিপদাপন্ন মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারিতাস বাংলাদেশের অগ্রাধিকারসমূহ

কারিতাস বাংলাদেশ স্থায়িত্বশীল কৃষির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বাস্তুসংস্থান রক্ষা, স্থায়িত্বশীল কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে স্থানীয় জনগণের খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন বিষয়টি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

কারিতাস বাংলাদেশের বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী (২০১৯-২০২৪) পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে অভিযোজনে সক্ষম কৃষি, পশু-পাখি ও মৎসচাষকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে যার লক্ষ্য হলো জনগণের জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে তার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে জলবায়ু অভিযোজন বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা, জলবায়ু সহনশীল জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি প্রদান করা, কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের জীবিকা উন্নয়নে কার্যক্রম হাতে নেওয়া এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে একাডেমিক গবেষকদের সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্ম-গবেষণা (অপঃরড়হ জবংবধৎপয) এর বিষয়টিও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কারিতাস বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে যেসকল প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো- ১) ক্ষুদ্র কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি খামার ও জীববৈচিত্র্যের সমন্বয় (সাফবিন); ২) স্থায়ীত্বশীল খাদ্য ও জীবিকায়ন নিরাপত্তা প্রকল্প (সুফল); ৩) দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশ কৃষি ও পানি দূষণ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি প্রতিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প; ৫) পানি ও পয়:নিস্কাশন, স্বাস্থ্যবিধি চর্চা ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুস্থ জীবন আনয়ন ও উন্নয়ন; ৬) বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সহনশীল জীবিকার চর্চার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি (প্রয়াস); ৭) বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সবুজ জীবিকায়ন ও জীববৈচিত্র্য উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন; ৮. মংলায় স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পানীয় জলের বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প; পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য নেতৃত্ব; ৯) স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ। এই সকল প্রকল্প কারিতাস বাংলাদেশের ৭টি আঞ্চলিক অফিসের আওতায় ২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কারিতাস বাংলাদেশ জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যেসকল জ্ঞান ও অভিযোজন কৌশল বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রদান করছে সেগুলো হলো-

কৃষি ক্ষেত্রে

কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চল বিবেচনা করে ড্রিপ ইরিগেশন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, মালচিং,

পার্চিং, সমন্বিত বালাইদমন ব্যবস্থা, জৈব কৃষিচর্চা, স্থানীয় প্রজাতির বীজ ব্যবহার ও জনগণের গ্রহণযোগ্য উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে সঠিক প্রযুক্তি, কৌশল ও তথ্য সম্প্রসারণ করা। কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

মৎস্য ক্ষেত্রে

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্যায়ে মাছচাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহস্থালী ছোট ও বড় পুকুর খনন ও পুনঃখনন ও বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থাসহ স্থায়িত্বশীল মাছচাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন। পুকুরপাড়ে বছরব্যাপি সব্জি চাষ, হাঁসের সাথে মাছ চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ ও খাঁচায় মাছচাষ, সমন্বিত মাছ চাষ ও সর্জান প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা। উন্নত মানের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য মৎস্য বীজ খামার স্থাপন, নার্সারি স্থাপন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্থানীয় ক্ষুদ্র প্রজাতির মাছচাষে উদ্বুদ্ধকরণ।

পশু/পাখির ক্ষেত্রে

ক্ষুদ্র আকারে পোল্ট্রী ও পশুপালন উন্নয়নে উন্নতমানের প্রজাতির চাষ, রোগ-বালাই দমনে টিকা ও পশু-পাখির চিকিৎসা প্রদান, উন্নত পদ্ধতিতে পোল্ট্রী ও পশুপালনে স্বল্প খরচে দেশী উপকরণের ব্যবহার ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার

কারিতাস বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃষ্টির পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য ছোট ও মাঝারি ধরনের পুকুর খনন ও পুনঃখনন, খাল খননে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর ফলে দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে যারা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সুপেয় পানির অভাবের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

বিকল্প আয়: দক্ষতা বিবেচনা করে কৃষিভিত্তিক ও অ-কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় অন্তর্ভূক্তি করা ও সম্প্রসারণ। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সুবিধা আদায় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশে উপযুক্ত যুবক নির্বাচন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা। তাছাড়া কৃষি উৎপাদনে বিশেষ করে বাড়ির আঙ্গিনায় শাক সবজি চাষের মাধ্যমে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করছে। এর ফলে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার

নবায়নযোগ্য শক্তির (জবহবধিনষব উহবৎমু) ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবার ও সমাজভিত্তিক এই শক্তি ব্যবহারের জন্য সোলার বা সৌর প্যানেল স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছে। জলবায়ু সহনশীল কৃষি এবং ওয়াশ প্রকল্পের মাধ্যমে কারিতাস রাজশাহী, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের আওতায় ৫টি উপজেলায় কৃষক সংগঠনকে ৬২টি সোলার-চালিত সেচ পাম্প প্রদান করা হয়েছে। সবুজ জীবিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গত দুই বছরে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার রানিগঞ্জ এবং চিলমারী সদর ইউনিয়নে ৪৫৫ দরিদ্র পরিবারে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল (সোলার হোম সিস্টেম) দেওয়া হয়েছে যারা পূর্বে জীবাশ্ম জ্বালানী (কেরোসিন) ব্যবহার করত।

দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকি হ্রাসে কারিতাসের ভূমিকা

কারিতাস বাংলাদেশ এর জন্ম লগ্ন থেকে অদ্যাবধি দুর্যোগ কবলিত, বিপদাপন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে থেকেছে সার্বক্ষণিকভাবে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ভোলা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ঠিক তার পরপরই মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবে বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পুণর্গঠনে সরকারের সাথে তৎকালীন বেসরকারি সংস্থা হিসেবে প্রচুর কাজ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় বিগত ৫০ বছরে কারিতাস বাংলাদেশ মাঝারি থেকে বড় সব ধরনের প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানসহ দুর্গত জনগণ, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে কাজ করেছে।

জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

কারিতাস বাংলাদেশ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ হতে এ পর্যন্ত ১২৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের মাঝে জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করেছে। এর মধ্যে ১১ ধরনের (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, বন্যা, বন্য প্রাণির উপদ্রপ (ইঁদুর বন্যা/হাতির আক্রমণ), আকস্মিক বন্যা, খরা, আর্সেনিক, ম্যালেরিয়া, ভূমিধ্বস ও শৈত্যপ্রবাহ) ৯৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও চার ধরনের (শরণার্থী সংকট-আটকে পড়া পাকিস্তানী বিহারী, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা), ভবন ধ্বস ও অগ্নিকাণ্ড) ১৬টি মানব সৃষ্ট দুর্যোগ উল্লেখযোগ্য।

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন (ডিআরআর) ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানো বিষয়ক কার্যক্রম

কারিতাসের কৌশলগত পরিকল্পনায় ডিআরআর ও জলবায়ু ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টর কারিতাস বাংলাদেশের ছয়টি কৌশলগত লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এ কৌশলগত পরিকল্পনায় ৫ম লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এর অধীনে জরুরি সাড়াদান, জলবায়ু পরিবর্তন, ডিআরআর ও রোহিঙ্গা রেসপন্স এর জন্য ৮টি কৌশলগত উদ্দেশ্য, ৯টি লক্ষিত ফলাফল ও ৪৪টি বাস্তবায়ন কৌশলকে বিবেচনায় রেখে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কারিতাস বাংলাদেশ "মানবিক সাড়াদান ও কমিউনিটি রেসিলিয়েন্স কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ" এর লক্ষ্যে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্নদের মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ২৮টি জেলার ১৭১টি উপজেলা ও দু'টি সিটি কর্পোরেশনের ২৭৭টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এ ৩৬টি ডিআরআর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ১,৪৪৬,০৫৩ জন মানুষ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দক্ষতা বৃদ্ধিসহ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিগত ৫০ বছরে কারিতাস বাংলাদেশের সেক্টরভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের চিত্র নিম্নরূপ:

- **জীবন রক্ষাকারী জরুরি ত্রাণ সহায়তা:** বিগত ৫০ বছরে কারিতাস প্রায় ৪০ লাখেরও বেশি মানুষকে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য, ১১১,০০০ পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা, ১৮,০০০ পরিবারকে সুপেয় পানি, ৩০৮,০০০ পরিবারকে ঔষধ, ১৪৬,০০০ পরিবারকে শীতবস্ত্র, ১০৫,০০০ পরিবারকে ঔষধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম, ৬৭,০০০ পরিবারকে জরুরি আশ্রয় সামগ্রী এবং ২,০০০ পরিবারকে মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করেছে।
- **জরুরি কৃষি উপকরণ:** অতি দরিদ্র কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ২,৩৫৯ মেট্রিক টন শস্য বীজ (আলু, ধান, গম) এবং বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদনের জন্য ৫০০ মেট্রিক টন সবজি বীজ বিতরণ করা হয়।
- **গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়ন কার্যক্রম:** মোট ১৬,৬৪৫ কিমি রাস্তা, ৪,০০৬টি কালভার্ট, ৬৯৮টি ব্রিজ, ১৭৯টি বাঁধ এবং ৩৩৬টি খাল খননের মাধ্যমে ৪-৭ কোটির বেশি মানুষকে সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে;
- **পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও হাইজিন (ওয়াশ):** মোট ৪৪,৯১৪টি টিউব-ওয়েল, ৪,৬৫৫টি কুয়া/রিংওয়েল, ১৯৬,৮৩০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ঘর, ১,৪৮৪টি পুকুর খনন করে ৪৪.৬ লক্ষ মানুষকে পানি ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।
- **আশ্রয়কেন্দ্র ও গৃহ নির্মাণ:** কারিতাস বাংলাদেশই প্রথম বেসরকারি সংস্থা যা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ ঘূর্ণিঝড় পরবর্তি সময়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে উপকূলীয় এলাকায় ৯টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে এবং পরবর্তীতে আরো ২৪৬টি সহ উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বমোট ২৫৫টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে যেখানে ১,৪৬৩,৯২১ জন মানুষ দুর্যোগকালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাছাড়া, ৮১৮,৫১৯টি দুর্যোগ সহনশীল স্বল্পমূল্যের টেকসই গৃহ নির্মাণে সহায়তা প্রদান করে।
- **অতিমারি কোভিড-১৯ সাড়াদান:** বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারিতে দাতা সংস্থা থেকে মোট ৩৮ কোটি ৮৬ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। কারিতাসের স্থানীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা ছয় সিটিকর্পোরেশন এবং ৪৪টি জেলার ১৪৩টি উপজেলার ৪৯০টি ইউনিয়নের ৯৬,৯৯৬টি পরিবারের মাঝে খাদ্য, নগদ অর্থ এবং জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী বিতরণ করে। এর বাইরেও ১৪ লক্ষ মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়।
- **মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত (রোহিঙ্গা) জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি সাড়াদান:** কারিতাস ১২টি ক্যাম্প এবং ৩টি উপজেলায় পানি ও পয়:নিষ্কাশন, শেল্টার, সুরক্ষা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, শিক্ষা, খাদ্য বহির্ভূত সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ৪৭০,০০০ জন মানুষকে সেবার আওতায় আনা হয়েছে।
- **স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** এ পর্যন্ত ২,৪৯৩টি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২,৭৪৯টি স্থানীয় সমাজ ভিত্তিক টাস্কফোর্স, ২৭৭টি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী অনুসারে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা পালন করে। এ পর্যন্ত ২৭৭টি ইউনিয়নে জনগণের ঝুঁকি বিশ্লেষণে অবদান রাখে এবং এর ভিত্তিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিতাস সহায়তা করেছে।
- **অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম:** কারিতাস ৪০০টিরও বেশি দুর্যোগ বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করে সাধারণ মানুষের মাঝে ভূমিধ্বস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য দুর্যোগে রক্ষার জন্য সতর্ক সংকেত, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক প্রতিবিধান প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথাগত নেতাদের অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি যুক্ত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার সাথে কারিতাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টর মোট চারটি প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে মোট ১১টি জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন প্রকল্প ও ৯টি ডিআরআর প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৯৫৪,৩৩৯,৯৪৪ টাকা (জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন ৬৮৬,০৭৮,৭২১; ডিআরআর ২৬৮,২৬১,২২৩ টাকা) তহবিল সংগ্রহ করে।

প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সর্বমোট সংগৃহীত তহবিলের মধ্যে আকস্মিক বন্যা ৬৭,৯৪৭,৮৪৪ টাকা; ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং ৬,১২৫,০০০ টাকা ও টঙ্গী এলাকার বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের জন্য ৫৪,৭২০,১৪৯ টাকা ও দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ও নওয়াবগঞ্জ উপজেলায় টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৩,৯০০,০০০ টাকা ও মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬০৩,৩৮৫,৭২৮ টাকার তহবিল সংগৃহীত হয়। এ তহবিল দিয়ে আটটি অঞ্চলের ১০টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নের ৪১,১৩৯টি (আকস্মিক বন্যা ৮,৮৬৬, অগ্নিকাণ্ড ৩০০, টর্নেডো ১৬৭, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং ১,০০০, রোহিঙ্গা সাড়াদান ৩০,৮০৬) পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ, হাইজিন উপকরণ, খাদ্য, গৃহ নির্মাণের উপকরণ, সুরক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা

করা হয়। একইসাথে ডিআরআর প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৯,৭৭৩টি বিপদাপন্ন পরিবারের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাযক্রম চলমান রয়েছে।

কারিতাসের উল্লেখযোগ্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পসমূহ

জিএফএ কনসালটিং গ্রুপ এর সাথে কারিতাস বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন:

বিগত ৮ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুলের অধীনে কারিতাস চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রাজশাহী অঞ্চলে মোট ১৩টি ট্রেড নিয়ে জিএফএ কনসালটিং গ্রুপ

এর অর্থায়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম্য এলাকা হতে মাইগ্রেশন বন্ধ/হ্রাস করার জন্য এলাকার যুবক ও মহিলাদের নির্দিষ্ট ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক সাবলম্বন, এলাকার উন্নয়ন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

কারিতাস জিএফএ-র সহায়তায় সফলভাবে প্রকল্প মেয়াদকালে মোট ২,৮৫৮ জন নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। জিএফএর প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ২টি মডেল অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে ই মডেল এর মাধ্যমে ১৮০ ঘন্টা অনুপাতে কারিতাস খুলনা, সাতক্ষিরা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ এলাকায় প্রশিক্ষণ এবং এ মডেল এ বিগত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে মোট ১৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর কারিকুলাম অনুসারে খুলনা বিটিএস প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এ মডেলের পাশকৃত ৯৫% প্রশিক্ষণার্থীর এবং ই মডেলের ৮০% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান অর্জিত হয়েছে। ই মডেলের মোট বাজেট ছিল ৫,৪০,৪৭,১৮৫ টাকা এবং এ মডেলের মোট বাজেট ছিল ৫২,৭৫.০৩৭ টাকা। ৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান ছিল।

সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর সাথে কারিতাস বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন

সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় গঠিত একটি সংগঠন যা উপকূলীয়, দুর্গম ও জেলে পরিবারসহ পরিবারের সন্তানদের জীবনমান পরিবর্তন এর জন্য কারিতাস বাংলাদেশের টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সহায়তার কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্পের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিগত একবছরে কারিতাস বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রশিক্ষণ চলমান রাখে। বিগত সময়ের অর্জনের ভিত্তিতে, এসডিএফ এর সাথে কারিতাস বাংলাদেশের টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ (আবাসিক/অনাবাসিক) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পুনরায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে গত ১৫ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। বর্তমান চুক্তিপত্র অনুসারে এসডিএফ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মেয়াদ হবে ১৫ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং এই সময়ের মধ্যে মোট ৪,০০০ জনকে ২৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

গবেষণায় কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত। কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই) কারিতাস

বাংলাদেশ ও বিভিন্ন অংশীজনদের গবেষণায় সহযোগিতা করে থাকে। মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ফিজিবিলিটি স্টাডি, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে। প্রকল্প গ্রহণে 'ফিজিবিলিটি স্টাডি'র ফলে বিভিন্ন সংস্থার নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণে সিডিআই সহযোগিতা করেছে। সিডিআই এর একটি সাফল্য হল সম্প্রতি জিআইজেড এর খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী অঞ্চলে 'ফিজিবিলিটি স্টাডি'র পর প্রায় ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গত 'কোভিড-১৯' সময়কালীন সর্বপ্রথম প্রান্তিক ও শহর পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর এর প্রভাব গবেষণা করে দাতা গোষ্ঠীর সাথে সহভাগিতা করা হয়েছে। কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট দু'টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে যা দাতা গোষ্ঠী ও অংশীজনেরা প্রশংসা করেছেন।

এ বছরটি কারিতাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারিতাস বাংলাদেশ উদ্‌যাপন করেছে এর সুবর্ণজয়ন্তী। সুবর্ণজয়ন্তীর মূলসুর- **কারিতাস বাংলাদেশ: ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা।** কারিতাস বাংলাদেশ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে আর্ত-মানবতার সেবায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পবিত্র বাইবেলের দয়ালু সমরীয়ের ভূমিকা পালন করছে। আশাহীনদের মাঝে আশা জাগাচ্ছে, যারা কষ্টে রয়েছেন, তাদের কষ্ট লাঘব করছে। ভবিষ্যতেও এই সংস্থা মানুষের যা প্রয়োজন সেই সেই সেবা নিয়ে তাদের দুয়ারে হাজির হবে- আশা ও ভালোবাসার বীজ বপন করতে, সমৃদ্ধশালী ও সুখী দেশ গড়তে। মহান খ্রিস্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ সকলকে জানাচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা!

শিশু সুরক্ষায় পরিবারের ভূমিকা

শিশির আঞ্জেলো রোজারিও

'শিশু সুরক্ষা' বিষয়টি বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। কাথলিক মণ্ডলীও শিশু সুরক্ষা বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। আর সে লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য নানাবিধ কার্যক্রম লক্ষণীয়। এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আলোচনা জনমনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই বিষয়টির গুরুত্ব না বুঝে এটিকে পশ্চিমা বিশ্বের চাপিয়ে দেয়া বিষয় হিসেবে বিবেচনা করছে।

কেন শিশু সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?

আমরা যদি প্রতিদিনের পত্রিকা ও রেডিও-টিভির খবর পড়ি বা শুনি, তাহলে শিশু নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন না কোন ঘটনা দেখে থাকি। অর্থাৎ প্রতিনিয়তই কোন না কোনভাবে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন, শোষণ, নিপীড়ন, জুলুম করা হচ্ছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিশু, অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি শিশু তাদের ২ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে কোন না কোনভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে সাধারণত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে তার বা পরিবারের লোকের অসচেতনতার কারণে তা প্রকাশ পায় না। তথাপিও আমরা প্রতিদিনই এ সংক্রান্ত ঘটনার প্রতিবেদন দেখতে পাই।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী বিশ্বের প্রতিটি শিশুর মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষিত। এটি একটি মানবাধিকার চুক্তি যা শিশুদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিকসহ সকল অধিকার নির্ধারণ করে। শিশু নির্যাতনের মাধ্যমে শিশুদের এসকল অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ফলে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সমুন্নত রাখতে এবং শিশুদের বিভিন্ন অন্যায় ও ঝুকি থেকে মুক্ত রাখতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

কাথলিক মণ্ডলীর দৃষ্টিতে শিশু নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে তার মূল শিক্ষা ও প্রেরণার বিরুদ্ধাচরণ। প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই *(মার্ক ১০:১৪)।"* অর্থাৎ তিনি শিশুদের বিশেষ যত্ন ও তাদের মর্যাদার বিষয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। সুতরাং যখনই কেউ কোন একজন শিশুর সাথে অন্যায় আচরণ করে তখনই সে নিজেকে মারাত্মক পাপে নিমজ্জিত করে। মণ্ডলী এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং শিশুদের সুরক্ষায় বিশেষভাবে সতর্ক। আর সে কারণেই মণ্ডলী শিশুর প্রতি অন্যায় প্রতিহত করতে শিশু সুরক্ষা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস একাধিক প্রৈরিতিক পত্রে শিশু সুরক্ষা বিষয়টি নিশ্চিত কল্পে নির্দেশনা দিয়েছেন। মান্ডলীক আইনেও শিশুর প্রতি অন্যায় বা নির্যাতনের প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিভিন্ন বিধান রয়েছে এবং এসংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে।

ছবি: রিপন টলেন্টিনো

সুতরাং বিশ্বের প্রতিটি দেশ এবং কাথলিক মন্ডলী প্রত্যেকেই শিশু সুরক্ষা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং সেজন্যই সর্ব পর্যায় থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে যেন বিশ্বের শিশুরা সুরক্ষিত থাকে এবং তাদের অধিকার রক্ষা পায়; ফলে তারা সুস্থ-সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

শিশু সুরক্ষা কি?

উপরের আলোচনায় বারংবার শিশু সুরক্ষা শব্দটি বলা হয়েছে, কিন্তু শিশু সুরক্ষা বলতে আসলে কি বুঝায় তা বলা হয়নি। শিশু সুরক্ষা হলো- একটি সুরক্ষিত পরিবেশ যেখানে ছেলেরা এবং মেয়েরা সকল প্রকার সহিংসতা, অপব্যবহার, শোষণ এবং বিচ্ছেদ থেকে মুক্ত; এবং যেখানে আইন, সেবা এবং আচার-আচরণ শিশুদের ঝুঁকি কমায়, ঝুঁকির কারণগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করে এবং শিশুদের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। এটি হলো একটি পদ্ধতি যেখানে সমাজের বা প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল উপাদানসমূহ শিশুদের প্রতি নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে সমন্বিতভাবে একযোগে কাজ করে।

শিশু সুরক্ষায় পরিবারের ভূমিকা:

সমাজের প্রতিটি শিশুই কোন না কোন পরিবারের অংশ। শিশুর জন্ম থেকে বেড়া উঠা প্রায় সবই সাধারণত পরিবারেই হয়ে থাকে। সুতরাং শিশুর প্রাথমিক সুরক্ষা সেখান থেকেই শুরু হওয়া প্রয়োজন। শিশু সুরক্ষা বলতে যে পরিবেশের কথা বলা হয়েছে সে পরিবেশ প্রথমত পরিবারে নিশ্চিত করতে হবে, চর্চা করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানে ও সমাজেও তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে প্রতিটি শিশুকে সচেতন করতে হবে এবং তার নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে। নিম্নে শিশুর প্রতি নির্যাতনের ধরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) শারীরিক নির্যাতন: যেকোন ধরণের সহিংস এবং ইচ্ছাকৃত সংযোগ বা যোগাযোগ যার ফলে সাধারণ বা মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক বা উভয় ধরনের ক্ষত তৈরি হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক আঘাত করা অথবা স্বজ্ঞানে বা অবহেলাবশত যেকোন শারীরিক আঘাত বা কষ্ট থেকে সুরক্ষা না করাও শারীরিক নির্যাতন।

শিশুরা সাধারণত পরিবারে গঠন বা শাসনের নামে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার

হয়ে থাকে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ নির্যাতনের শিকার হয়। এজন্য পরিবার বা প্রতিষ্ঠানে একটি নিয়ম থাকা দরকার যাতে কি-না শিশুর প্রতি কোনভাবেই শারীরিক নির্যাতন না করা হয়। ইতোমধ্যে সরকারীভাবে আইন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি বন্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর সাথে শাসনের পরিবর্তে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

খ) মৌখিক নির্যাতন: কোন ব্যক্তিকে মুখের ভাষা দিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ, লাঞ্ছিত করা, ছোট করা বা ভয় দেখানো, কটুক্তি করা, খারাপ নামে ডাকা, ইত্যাদি। এধরণের বিষয়গুলোকে খুবই স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু এধরণের আচরণের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। এগুলো শিশুর মানসিক বিকাশে বাধা তৈরি করে।

প্রতিটি পরিবারেই শিশুরা সাধারণত এ ধরণের মৌখিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা অনিচ্ছাকৃতভাবেও এ ধরণের আচরণ করে থাকে। এ আচরণগুলো শিশুর মনে একটি ভীতি তৈরি করে এবং একসময় সে নিজেও অন্যের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে থাকে। সুতরাং পরিবারে যদি একটি সুন্দর ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা যায় তাহলে শিশুর বিকাশে তার ইতিবাচক প্রভাব পরবে। এছাড়া, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যেন সে অন্যের সাথে এর ধরণের আচরণ না করে।

গ) মানসিক নির্যাতন: ক্রমাগত অসদাচরণ করা যা শিশুর মানসিক বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অত্যধিক উদ্বিগ্ন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা কমে যাওয়া, ভালবাসা না পাওয়া এবং অবাঞ্ছিত হওয়ার ধারণা তৈরি হওয়া, বাধা দেওয়ার স্বভাব এবং অতিরিক্ত চাপা স্বভাব- এ সবই মানসিক নির্যাতনের কারণে হতে পারে।

পরিবার হলো শিশুর ভালোবাসা পাওয়ার জায়গা। সেখানে যদি সে মানসিকভাবে নির্যাতিত হয় তাহলে সে কখনই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। একই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সে পরিবারের বাইরের কারো দ্বারা কি এ ধরণের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কি-না। তার আচরণে যদি অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সে কোন সমস্যার মধ্যে রয়েছে। সেক্ষেত্রে তার সাথে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য নেয়া।

ঘ) যৌন নির্যাতন: জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে একজন শিশুকে যৌন কাজে অংশগ্রহণ করানো, সেক্ষেত্রে শিশু সচেতনভাবে করুক বা না করুক। যেকোন ধরণের খারাপ শারীরিক সংস্পর্শ এর অর্ন্তভূক্ত। নির্যাতনকারী একজন শিশু বা প্রাপ্ত বয়স্কও হতে পারে। শারীরিক সংস্পর্শ ছাড়াও যৌন সংশ্লিষ্ট যেকোন আচরণ যেমন: যৌন সংক্রান্ত উপকরণ বা ছবি অথবা যৌনকার্যক্রম দেখানো বা এধরণের কথা লিখা বা বলা এ সবই যৌন নির্যাতন।

বর্তমান সমাজে শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। এর বেশির ভাগই ঘটে থাকে শিশুর কাছের মানুষের দ্বারা। এটা অধিকাংশ সময়ই পরিকল্পিত এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এ ধরণের ঘটনার শুরু হয়ে থাকে। প্রথমত শিশুরা এ ধরণের পরিস্থিতির শিকার হলে ভয়ে তা কাউকে বলে না বা বলতে পারে না। তবে অবশ্যই তার শারীরিক ও মানসিক আচরণে তার প্রভাব বা একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। সুতরাং শিশুকে কখনওই একা কারো সাথে একান্তভাবে কোন কার্যক্রম করতে দেয়া যাবে না। শিশুরা সাধারণত কৌতুহলী হয়, সেজন্য যদি শিশুর কোন আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয় তাহলে অবশ্যই তার কার্যক্রম অনুসরণ করা এবং তাকে যেকোন বিপদে পরা থেকে রক্ষা করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাকে এ বিষয়ে সচেতন করা; কোন্ ধরণের আচরণ তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তা তাকে শেখানো।

ঙ) প্রযুক্তিগত নির্যাতন: প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিশুর সাথে যেকোন ধরণের অসদাচরণ করা, বিশেষভাবে যৌন নির্যাতন বা এ সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রম। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে এ ধরণের ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে। এ ধরণের ঘটনার পরিণাম খুবই মারাত্মক, যা শিশুর হত্যা বা আত্মহত্যার পর্যায়েও যেতে পারে।

তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং শিশুর শিক্ষা বা অন্যান্য প্রয়োজনে, এমনকি পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতার ফলে শিশুরা প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের সাথে নিজেদের যুক্ত করে। কিন্তু তারা অনেক সময় কৌতুহলের বশে বা অন্যের প্ররোচনায় নিজেদেরকে অসংলগ্ন বিষয়ের সাথে যুক্ত করে ফেলে। অধিকাংশ সময় তারা যৌন সম্পর্কিত ছবি বা ভিডিও দেখা বা আলোচনায় অংশ নেয়। পরবর্তীতে তা নেশায় পরিনত হয় এবং একসময় নিজে অন্যায় পরিস্থিতি বা শোষণের শিকার হয়, যার পরিণাম হয় ভয়াবহ। সেজন্য পরিবারের সদস্যদের উচিৎ শিশুকে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা, বিশেষভাবে কোন আচরণ গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়। পাশাপাশি শিশুর এ ধরণের প্রযুক্তির ব্যবহার মনিটরিং করা, প্রয়োজনে প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় তার সাথে থাকা।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবার হলো শিশুর জন্য একটি সবচেয়ে নিরাপদ স্থান যেখান থেকে সে সুস্থ-সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার উপাদান এবং সহায়তা পায়। সুতরাং শিশুর সুরক্ষার জন্য পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বলা যেতে পারে যে, আমরা সকলে চাইলেই প্রতিটি শিশুকে রক্ষা করতে পারি; পারি তাকে একটি সুস্থ-সুন্দর বেড়ে উঠার পরিবেশ দিতে। পারি সমাজের সকল অন্যায়-অন্যায্যতাকে দূর করতে এবং প্রতিটি শিশুকে সুরক্ষা দিতে। আসুন, আমরা প্রত্যেকে সচেতন হই, অন্যকে সচেতন করি এবং একটি সুন্দর ও শক্তিশালী পরিবেশ নিশ্চিত করি॥ ৺

ছোট্ট শিশু যিশু

সিস্টার আন্না মারীয়া রায় সিএসসি

ছোট্ট শিশু যিশু শান্তিদাতা ভাই
ছোট্ট বলে কাউকে যেন অবহেলা না করি তাই
দীন-দুঃখী, অভাবী মানুষ যত দেখি এ ধরায়
ক্ষুদ্র বলে তাদেরকে যেন না করি অবহেলা।
ক্ষুদ্র হতে পারে তোমার পাড়ার প্রতিবেশি
ক্ষুদ্র হতে পারে রাস্তায় পড়ে থাকা শিশুটি
ক্ষুদ্র শুধু টাকা-পয়সায়, ক্ষুদ্র সে তো নয়,
মনের দ্বার বন্ধ রাখা ক্ষুদ্রতার পরিচয়।
ছোট্ট শিশু যিশু সবার কোলে হাসে,
মানে নাকো ধনী-গরীব সবাইকে ভালোবাসে।
যিশুর সনে এসে চলো বিশাল হৃদয় গড়ি,
অন্যের মঙ্গলকামনা যেন সবসময় করি।
শিশু মানে সরল-সোজা সদা হাসি-খুশী
ছোট্ট কোন উপহারেই আনন্দে মাতামাতি।
তাই এসো সবে শিশুর মতো নম্র হতে শিখি,
অহংকারকে চূর্ণ করে পরস্পরকে ভালোবাসি।
ভুলে যাই যত জমিয়ে রাখা কষ্ট, দুঃখ, ক্লেশ
ক্ষমা করে কাছে টেনে নেই
ভুলে যাই ভেদাভেদ।
শিশুর মত ছোট্ট ছোট্ট হাসি আর খুশী,
দেই উপহার পরস্পরকে,
ভালোবাসাতেই থাকি॥

নৈতিকতার অবক্ষয়: গ্রামীণ জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা

আগষ্টিন ডি'ক্রুজ

আমি বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র সামাজিক সংগঠন "কারিতাস বাংলাদেশ-রাজশাহী অঞ্চলে" দীর্ঘ ৩১ বছর দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে সেবাকর্ম করার পর ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেছি। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ হতে আমি আমার স্থায়ী আবাসস্থল নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পৌরসভার বনপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে অবস্থান করছি।

উচ্চ শিক্ষা ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে দীর্ঘ প্রায় তিন যুগেরও বেশি সময় আমাকে গ্রামের বাইরে অবস্থান করতে হয়েছে। তবে শিশু ও কিশোর বয়সে পরিবার ও সমাজের বড়দের কাছ থেকে যে আদব-কায়দা এবং আচরণ শিখেছি, তা আমি আমার পরবর্তি জীবনে গুরুত্বের সাথে চর্চা করতে চেষ্টা করেছি। আমার বাবা বলতেন, "যে করে গুরুজনের কথা অট (বরখেলাপ), সে পিন্দে (পড়বে) ছালার চট"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করেনা, আদেশ মেনে চলেনা, তাদের জীবনে কখনো উন্নতি হয়না, সে সর্বদা দুরাবস্থায় থাকে। আমি নিজে এই উক্তিটি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের বুঝাতে চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে সীমিত পরিসরে আমি কাথলিক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার কর্মাভিজ্ঞতা সহভাগিতা করছি। বিগত ৬টি বছর আমি বাড়িতে অবস্থান করে গ্রামের পরিবার/বাড়িগুলো ঘুরে দেখেছি। বয়জ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে গ্রামীণ জীবনযাপন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেয়ার চেষ্টা করেছি। সমাজ ও স্থানীয় মণ্ডলীর কাঠামোর সাথে সংস্পৃক্ত হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেছি। সমবয়সিদের সাথে মিশে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে ভাল-মন্দ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। আর ছোটদের সাথে কথা বলে তাদের চাল-চলন ও আচরণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে আমাদের গ্রামের বিধবা এবং শিশু-কিশোরদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার বেশি ছিল। কারণ, আমাদের গ্রামের পরিবারগুলোর মধ্যে পরিবারে বিধবা নেই, এমন পরিবার সংখ্যা খুবই কম। আর আমার জানামতে, পুরুষদের (স্বামী) নানারকম অপকর্মের কারণেই বিভিন্ন বয়সের নারীদের (স্ত্রী) আজ এমন করুণ দশা হয়েছে। আমার এক গুরুজন (কাকা) ও সর্বজন পরিচিত সুবল এল. রোজারিও এই সকল অসহায় বিধবাদের একত্রিত করে তাদের জন্য সামান্য কিছু করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন,

ছবি: ইন্টারনেট

যিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজেই আজ অসহায়। তাছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের জন্য মিশতে হয়েছে রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, কৃষি শ্রমিক, ভ্যান চালক, কামার, কুমার, টিভি মেকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, ড্রাইভার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে। অবসর জীবনযাপনে গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে যে ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তন আমার নজরে এসেছে, তা নিয়ে একান্তই ব্যক্তিগত মতামত আপনাদের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমার এই লেখা। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি বা মহলকে উদ্দেশ্য করে আমার এই লেখা নয়। সুতরাং অকারণে কোন ধরনের দুঃখ ও কষ্ট না পাওয়ার জন্য সম্মানিত পাঠক ও সকলের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ রইলো।

গ্রামীণ যে সকল ভাল চর্চা/অভ্যাস/সুশিক্ষা হারিয়ে গেছে, যার জন্য আমার খুব আপসোস হয়; যেমন-

- বয়স্কদের আড্ডা, যেখানে মনের কথা নির্দ্বিধায় অন্যদের কাছে বলতো। আর ছোটরা তা থেকে শিখত।
- দল বেধে কাজ করা, "অর্থের বিনিময়ে নয় বরং কাজের বিনিময়ে কাজ" করতো। জমি নিড়ানো, পিঁয়াজ ও ধানের চারা রোপন, মাটি কাটা, জমি চাষ, ধান/ফসল কাটা-মলা ইত্যাদি কাজে সম্মিলিত গানের তালে তালে কাজ করতো।
- পরিবারে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, পরিবারের ছোট-বড় সকলে মিলে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতো।
- পরিবারে গল্পের আসর, ছোটদের জন্য শিক্ষামূলক গল্প, রূপকাহিনী, গান-অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতো।
- যাত্রাপালা, নিজেরাই অভিনেতা সেজে মঞ্চায়ীত করতো।
- দল/গ্রামভিত্তিক খেলাধূলা, কাবাডি, হাডুডু, ফুটবল, তাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড করা হতো। প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল আয়না-চিড়ুনি, ম্যাচ, লুঙ্গি-গামছা, কাঠের তৈরি ছোট-বড় সিল ইত্যাদি।
- মাঠে দল বেধে গরু চড়ানো, ডাঙ্গ-টংকি খেলার সাথে থাকতো গরুর লড়াই ও নিজের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার কুস্তি প্রতিযোগিতা।
- ঘুঁড়ি উড়ানো, দামাল ছেলেরা হাতে তৈরি ঘুঁড়ি, ডাউস, কুয়ারি, ফিঙ্গে ইত্যাদি উড়িয়ে আনন্দ করতো।
- কিশোর-কিশোরীরা বিকালে ও চাঁদনি রাতে একসাথে বদন, বৌ-ঝি, কানামাছি ইত্যাদি খেলায় ব্যস্ত থাকতো। দুষ্টামির ছলে অন্যের গাছে চড়ে বা গাছে ঢিল মেরে আম পাড়া, পেয়ারা, বড়ই, তেতুল খাওয়া, আর জমি থেকে ওলকপি, গাজর, মূলা,

টমেটো, খিরা, তরমুজ ইত্যাদি খাওয়ার মজাই ছিল অন্যরকমের।

- শিক্ষালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদেরকে যুগপোযোগি মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন কর্মসূচি দায়বদ্ধতার সাথে পরিচালনা করতেন, যার মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই শিশুরা মানবিক গুণসমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে উৎসাহিত হতো। প্রাথমিক থেকে সকল প্রার্থনা মুখস্ত বলতে পারতো।

উপরের জীবন ঘনিষ্ঠ ও ভাল চর্চা/অভ্যাস/ সুশিক্ষাগুলো হারিয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমানে যেসকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে;

- ছোটরা বড়দের সম্মান দেয়না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উপহাস ও অশ্রদ্ধামূলক আচরণ দ্বারা জর্জরিত করে তোলে। কারণ, তারা সঠিক আদব-কায়দা পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে শিখতে পারছে না।
- অধিকাংশ পরিবারে বড়রা ছোটদের বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখে না। কারণ, পারিবারিক জীবনযাপনে অতি ব্যস্ততা (টিভি সিরিয়াল দেখা ও মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকা, কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি সম্পৃক্ততা ও সময় ব্যয় করা অথবা অনেক বেশি অলসতা)। আবার কোন কোন পরিবারে ছোটদেরকে অনেক ব্যস্ত বা চাপে রাখা হয়।
- অতিমাত্রায় জাগতিক বিষয়ে বিশেষ করে অর্থ-সম্পদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে। ব্যক্তি, পারিবার ও সমাজ সকল ক্ষেত্রেই এই ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্পদের দিকে বেশি মনোযোগ নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে বিলীন করে দিচ্ছে।
- পারিবারিক বন্ধন শিথিল ও দুর্বল হওয়ার কারণে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমছে। পরস্পরের মধ্যে সংলাপ, যোগাযোগ, সম্পর্ক, আদান-প্রদান, সহভাগিতা কমছে।
- আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের ভাল অভ্যাসগুলো অবহেলিত হচ্ছে। ডিস লাইনের সুবাধে টিভি সিরিয়াল দেখার আকর্ষণ এবং সহজ ইন্টারনেট সুবিধার ফলে মোবাইল ফোনের প্রতি সকল স্তরের আসক্তি আশংকাজনকভাবে বেড়েছে।
- একইভাবে পয়সার বিনিময়ে যত খুশি ইন্টারনেট; স্মার্টফোনের অপব্যবহারের মাধ্যমে সকলপ্রকার অনৈতিক বিষয়ে আসক্তিতে যুবসমাজ আজ নৈতিক অবক্ষয়ের তুঙ্গে বা শেষ প্রান্তে অবস্থান করছে।
- লেখা-পড়া না জানা বা কম জানা অভিভাবকগণ আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিভাইসের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন নয় বলে তাদের সন্তানদের অনৈতিক স্মার্টনেজ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি-আদর্শ অনুসরণে শিথিলতা, কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন, উন্নত দেশের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে শাসনের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর মেয়েরা অপরিণত বয়সেই অখ্রিস্টান ছেলেদের সাথে প্রেমলীলা করছে। যা পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীকে অনেকাংশে হেয় প্রতিপন্ন করছে।
- অনৈতিক কার্যকলাপ করার ক্ষেত্রে ছোটরা বড়দের ভয় পায়না। বরং বড়রা ছোটদের বাধা দিতে ভয় পায়। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে বড়রাই অনৈতিক কার্যকলাপের (নেশা সেবন, উচ্ছৃংখল জীবনযাপন) সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, যা ছোটরা টের পায় এবং অনুসরণ করে।
- মানবিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে, পুরুষরা বাড়িতে থেকে এলাকায় কাজ করার পরিবর্তে বাইরে গিয়ে বেশি টাকা আয় করতে আগ্রহি। বিশেষ করে কৃষি কাজে নিজেদের মানুষ/শ্রমিক খোঁজে পাওয়া দুস্কর। আরামপ্রিয় মানুষগুলো কৃষি শ্রমিক পেশা বাদ দিয়ে চাকরি, ব্যবসা, কন্ট্রাক্টর, মহাজনি ব্যবসা ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি আগহি।
- কোন কোন পরিবারে, স্বামীর দুর্বলতা ও উদাসীনতার কারণে স্ত্রী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অবৈধ জীবনযাপন চালিয়ে যাচ্ছে।
- পরিবারে স্বামীর শাসনের বিকল্প নেই। কিন্তু স্বামী যখন উপার্জনের উদ্দেশ্যে এলাকা বা দেশের বাইরে অবস্থান করে, সেখানে স্ত্রীইতো পরিবারের কর্তা ও সর্বেসর্বা। স্বামী জানেই না অথবা জানার প্রয়োজনও মনে করেনা যে তার অবর্তমানে স্ত্রী কিভাবে জীবনযাপন করছে।
- প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ-সম্পর্ক অনেক কমেছে। যার ফলে জরুরি প্রয়োজনে একে অপরের ডাকে সাড়া দিতে চায় না।
- প্রতিবেশির সাথে বিরোধ বৃদ্ধি বা সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার কারণে অখ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবণতা বেশি। অখ্রিস্টানদের সাথে সম্পৃক্ততা ও দুর্বল সমাজ কাঠামোতে সমাজনেতারা ন্যায্যতার পক্ষে কথা বলতে সাহস পায় না।
- মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী আচরণ পরিহার করে বিলাসিতাপূর্ণ আচরণ অনেক পরিবারকে বড় ঋণের ফাঁদে পড়তে বাধ্য করছে। পারিবারিক আনুষ্ঠানিকতায় ব্যয়-বিলাসিতার প্রতিযোগিতার কারণে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ছে।
- সঠিক মনিটরিংয়ের অভাবে তরুণ-তরুণীদের রুটিন বিহীন ঘুরাঘুরি ও আড্ডা বাড়ছে, যা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে। ফলে তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং অসামাজিক ঘটনা বাড়ছে।
- সুস্থ নেতৃত্বের অভাবে গ্রামীণ সভা ও বিচার শালিসে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপরীত পক্ষ তা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে কিশোর ও যুবাদের কাছে নেতৃবর্গের সম্মান ও মর্যাদা দিন দিন কমে আসছে।
- সমাজে আদর্শবান ব্যক্তির বড়ই অভাব। খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহনে ত্যাগস্বীকার করার মনোভাবের অভাব, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা ও বৈষম্যের কারণে ইতিবাচক মূল্যবোধগুলো আজ অকার্যকর। দুই-একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এখনও বেঁচে থাকলেও তাদের আদব-কায়দা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সক্ষমতা অনুসরণ করতে বর্তমান প্রজন্মের নেতারা আগ্রহী নয়। বরং বয়োজ্যেষ্ঠদের সাইড অব রেখে মাতব্বরি করতে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
- সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা, ধৈর্য, দয়া-মায়া-মমতা, সহভাগিতা ও সহযোগিতা, বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ সেবাদানের মনোভাব কমছে। ফলে নেতৃত্বদানে

উপযুক্ত ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

- সকল পর্যায়ে পড়াশুনায় ভাল ফলাফলের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, অপরপক্ষে শিক্ষার গুণাগুণ অর্জনের প্রতি গুরুত্ব অনেক কমেছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষার সুফল থেকে পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী বঞ্চিত হচ্ছে।
- একসাথে দল বেধে কাজ করার পরিবর্তে একা একা কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে। অন্যদিকে মনেযোগ সহকারে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার মানসিকতা অনেক কমছে। উপরন্তু কাজের ফাঁকি দেওয়ার মনোভাব বেড়েছে।
- অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড়দের সাথে ছোটদের (শিশু-কিশোর) অবাধ মেলামেশা বাড়ছে। ফলে তারা খুব সহজেই বড়দের নেতিবাচক আচরণে আসক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে ধুমপান, বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্তি, মন্দ/অশালীন (ছিউলি) কথাবার্তায় তারা দ্রুত পারদর্শী হয়ে উঠে।
- ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে খ্রিস্টীয় সাক্ষ্য প্রদর্শনে সমাজ ও মণ্ডলীতে পরিচালক ও ভক্তসাধারণের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। দায়িত্বপালন ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে ও স্তরে সংশ্লিস্টদের তিন নম্বর হাত **'অজুহাত'** প্রদর্শন বহুলাংশে বেড়েছে।

বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিশ্বায়ন পরিস্থিতি পারিবারিক জীবনকেই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে। ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক ধর্মবিশ্বাসের জীবনে দুর্বলতা, বিশ্বাস অনুশীলনে উদাসীনতা ও শিথীলতা, বিশ্বাসের সাক্ষ্যদানে অনীহা এবং ধর্মীয়, নৈতিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব খুবই ভাবনার বিষয়। আর তাই সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী প্রতিটি পরিবারের সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেই "পরিবারে দয়া" বিষয়টি নিয়ে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ হতে ২০ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধ্যান ও বাস্তব জীবনে তা আরও গভীরভাবে অনুশীলন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

এমতাবস্থায় আমি মনে করি, যীশু, মারীয়া ও যোসেফকে নিয়ে নাজারেথের যে পবিত্র পরিবার, তার আদর্শকে সামনে রেখে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে "সন্তানদের গঠনদানে" পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজনেতা হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই আরও বেশি মনযোগি হওয়া দরকার।

১) বিবাহিত দম্পতির যথার্থ প্রৈরিতিক দায়িত্ব হল- মানবজীবন বিস্তার করা ও সন্তানকে গঠন ও শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। বিবাহিত দম্পতি নিজেদের যেসকল সন্তান জন্ম নিয়েছে ও যারা ভভিষ্যতে জন্ম নিবে তাদেরও মঙ্গল চিন্তা করবে, যুগলক্ষণ বুঝতে শিখবে, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর কল্যাণ চিন্তা করবে। সুতরাং বিলাসিতা নয় বরং বিবেকের নির্দেশ দ্বারা জীবন পরিচালনা করতে হবে। কেবলমাত্র সন্তান জন্মদানই নয়, কিন্তু দুইজনের (পিতা-মাতা) মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, নিজেদের ও সন্তানের কল্যাণ, ভালবাসার গভীরতা ও পরিপক্কতা, জীবনের মিলন ও বিবাহ-বন্ধনের মূল্য ও অবিচ্ছেদ্যতা দাবি করেই তা করতে হবে।

২) দাম্পত্য জীবনে বিশুদ্ধতা-গুণের অনুশীলন করতে হবে। যেসব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঐশবিধান ও মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থি, তা ব্যবহার না করা। এক কথায় দায়িত্বশীল পিতা-মাতারূপে সন্তানের জন্মদান, খাঁটি মানবিক মর্যাদা ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

৩) বিবাহ ও পরিবারের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। বিশেষ অর্থে পরিবার হলো, মানবিক উৎকর্ষের বিদ্যায়তন। প্রৈরিতিক দায়িত্ব পালনে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে চিন্তা-চেতনা, পারস্পারিক আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

৪) সন্তানের গঠন প্রশিক্ষণে পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি, পরিবারে মায়ের কেন্দ্রিয়স্থানীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীদের ন্যায়সঙ্গত সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ না করা, সন্তানের জীবনাহ্বান বুঝতে ও ধর্মীয় আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম করে তুলতে হবে।

৫) দাম্পত্য প্রেমের মর্যাদা, ভূমিকা ও তার অনুশীলন সম্পর্কে সন্তানদের উপযুক্ত ও সময়োপযোগি শিক্ষাদান করতে হবে। বিশেষ করে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে এই শিক্ষাদান করা অবশ্য-কর্তব্য।

৬) পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি, যেখানে বিভিন্ন পুরুষ বা বংশের মানুষ সমবেত হয় এবং পরিবারে ও সমাজে অনেক প্রকার প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এমন অবস্থায় সন্তানদের সঠিক শিক্ষাদান, পরিবার গঠন সম্পর্কে সুবিজ্ঞ পরামর্শ ও পরিচালনা দান করা পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিশেষ করে উপযুক্ত বয়সে সন্তানদের জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী মনোনয়নের উপর কোন জোর না খাটানো বা তাদেরকে বাধ্য না করা।

৭) সন্তানদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এবং সংঘ-সমিতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দায়িত্বপালনে উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান ও সমাজ পর্যায়ের সকল স্তরেই 'অযোগ্যদের বর্জন এবং যোগ্যদের বরণ' এই নীতি-পদ্ধতি সচেতনভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৮) শিক্ষালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপোযোগি মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে ছোটবেলা থেকেই মানবিক গুণসমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে পারে। উল্লেখ্য যে, উচ্চশিক্ষা লাভের পাশাপাশি মানবিক গুণগুলো অর্জন এবং ব্যবহারিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে খ্রিস্ট-বিশ্বাসের আলোকে জীবন পরিচালনা করা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

সর্বোপরি মাণ্ডলিক ঐতিহ্যগত শিক্ষা ও বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পারিবারিক নিজস্ব পরিকল্পনায় ও কর্মকাণ্ডে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের প্রকাশ্য চর্চায় প্রার্থনা ও পারিবারিক সেবায় আমাদের তৎপর হতে হবে। সাধ্বী মাদার তেরেজার কথা স্মরণ করি; তিনি বলেছেন, "আপনি প্রার্থনা করেন, আপনি বিশ্বাস করবেন, আপনি যদি বিশ্বাস করেন, আপনি ভালবাসবেন, আপনি যদি ভালবাসেন আপনি সেবা করবেন"। কাজেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রার্থনা যতবেশি সক্রিয় ও গভীর হবে, পরিবারে সবার মধ্যে ভালবাসা ও সেবা ততবেশি প্রাণ পাবে।

আসুন পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ, আমরা নিজেদের জীবন ও পরিবার সম্বন্ধে আরও মনোযোগী ও সচেতন হই। ঈশ্বরকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন নিজেকে ও নিজ নিজ পরিবারকে উৎসর্গ করি। দয়ালু মানুষ গঠনে পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরস্পর পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করি। আমাদের পারিবারিক জীবন নবায়ন করি। সন্তানদের সময়মত যথা-উপযুক্ত যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করি, যেন তারা পরস্পরের সাথে একতা, মিলন ও শান্তিতে বসবাস ক'রে এবং খ্রিস্টসাক্ষ্য বহন করতে উৎসাহিত হয়। ❧

যারা অপমানেও ধন্য

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত, বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধকে রক্ষা করার আন্দোলনে, বিপ্লবের চূড়ান্ত সিঁড়িতে পৌঁছলে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, জাতীয়তবাদের অস্বাভাবিক ধারায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বশেষ নির্দেশে, মাতৃভূমি বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন করার প্রত্যয়ে এবং পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের স্পর্শকাতর রাজনীতির বৈষম্যের সমাধানে, ঐতিহাসিক স্বশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নামই বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করা অবধি তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে, স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ এদেশের আদিবাসীদের পবিত্র রক্ত স্নাত মাটিতে সংগঠিত যুদ্ধের নাম ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধ। সময়ের দাবিতে যথাযথলগ্নে মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হয় বটে! যুদ্ধের মৌলিক কারণ ও লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে অদ্যাবধি আলোচনা অব্যাহত আছে এবং থাকবে বিধায় স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসের মূল্যায়ন করার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আগামীতেও স্মৃতিচারণ হবে, এমনটারও কোন নিশ্চয়তা নেই!

১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট, উপনিবেশী বৃটিশ শাসকের কবলমুক্ত হয়েও বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় উপনিবেশে পরিণত হবার যন্ত্রণা, বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলো। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও গোত্রের বিভিন্ন মুখি সংস্কৃতি উপেক্ষা করে কেন্দ্রিয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানবাসী সংখ্যাগুরুদের উপর পশ্চিমা ভাষা উর্দূ চাপিয়ে দেবার প্রতিবাদে, তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকায় সফরে এসে উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করেন। তৎকালিন বিপ্লবী ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা উর্দূ ঘোষণার প্রতিবাদ জানালে, ভাষা আন্দোলনের কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মৌলিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে, ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে, আমগাছ তলায় অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনতার সমাবেশ থেকে প্রস্তাবিত স্মারকলিপি পেশ করার উদ্দেশে জগন্নাথ হলমুখি বিপ্লবী জনতার শোভাযাত্রায় পুলিশ বাধা দেয়। পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি বাড়তি জনবল নিয়ে পুনরায় শোভাযাত্রা আরম্ভ করলে, প্রতিবাদী ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে পুলিশের গুলিতে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার রাজপথেই শাহাদাৎ বরণ করেন। ছাত্র হত্যার দায়ে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ দেশব্যাপী আপোষহীন সংগ্রাম ও হরতাল ঘোষণা করা হয়। ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা “মর্নিং নিউজ” ছাত্র আন্দোলনের প্রতিকূলে সংবাদ প্রচার করে। সে যুগে পুরাতন ঢাকার জুবিলী প্রেস থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো বিধায়, বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা প্রেসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেদিনও পুলিশের গুলিতে আরো দু’জন নিহত হলেন। ঘটনার প্রতিবাদ এবং পরবর্তী বৎসর শহীদ দিবস পালন করতে গেলে সরকারি বাধাগ্রস্থতার কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস নামে নতুন ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সভার স্থল আমতলায়ই গড়ে ওঠে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার। অপর পক্ষে ক্ষমতাশালী মুসলিম লীগের অবিরত রাজনৈতিক নির্যাতনে জন্ম নেয় নতুন দল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পর্যায়ক্রমে দলটি আওয়ামী লীগ নামে হয়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তানি জনতার প্রিয় দল। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেও পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যগত কারণে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতা লোভী সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন সামরিক আইনের মাধ্যমে নিজেই ক্ষমতা দখল করে নেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রধান ফিরোজ খাঁ নূনকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করা হয়। উন্নয়নের দশক পার করা পর্যন্ত আইয়ুব খাঁনকে এবং পাকিস্তানকে উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে বটে! শেষ অবধি ছাত্র রাজনীতির কঠোর প্রভাব কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের দীর্ঘস্থায়ী কারাবাস হওয়ায় দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা হতো তৎকালিন ছাত্র রাজনীতির নিজস্ব ধারায়। আওয়ামী লীগের উপদল হিসেবে ছাত্রলীগই তৎকালিন রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার কারণে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎকালিন জগন্নাথ কলেজকে বলা হতো রাজনৈতিক সূতিকাগার। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব সমর্থক নেতা-নেত্রীদের গণহারে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আত্মঘাতি কেন্দ্রিয় সরকার শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে শেষ দফায়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে নিঃশেষ করে দেবার পরিকল্পনা হাতে নেয়। ছাত্র নেতারাও পর্যায়ক্রমে কারাগারে আশ্রয় লাভ করেন। অপরদিকে ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে গণতন্ত্র উদ্ধারে মহাবিপ্লব চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদ “ডাকসু” হয়ে ওঠে আন্দোলনের মধ্যমনি। মৌলিক গণতন্ত্রের গতিতে পালাক্রমে বিভিন্ন হল থেকে পর্যায়ক্রমে “ডাকসু” প্রতিনিধিত্ব করার সুবাদে আমার দেখা নেতৃত্বে রাশেদ খাঁন মেনন, ফেরদৌস আহমদ কুরেশী, মালেকা বেগম, তোফায়েল আহমদ, ডাকসু কেন্দ্রিক ছাত্র নেতৃত্বের মহানায়ক হয়ে উঠেন। ১৯৭০-৭১ এর ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আ.স.ম আবদুর রব, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে, ২ মার্চ গণবিপ্লবের ধারা বদলে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে নতুন দিগন্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে বটে! মার্চ মাসের নির্ধারিত সময়ে সংসদ অধিবেশনে বসার প্রস্তুতি নেয়া কালে ১৯৭১ এর ১ মার্চ জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। আত্মঘাতী ঘোষণার প্রতিবাদে ২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরস্থ বটতলায় “ডাকসু” প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। গণ আন্দোলন শক্তিশালী করার প্রত্যয়ে ৩ মার্চ, ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক মহাসভার আহ্বান করে। ২ মার্চ ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম. আবদুর রব, ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, বটতলার বিপ্লবী সভায় সেদিন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বটতলায় মঞ্চ না থাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম গাড়ী বারান্দার ছাদ মহাসভার মঞ্চ মনোনীত হয়। পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজমের ছবিতে আগুন দেবার পর জনাব শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠ করেন। অতঃপর, শিব নারায়ণ দাসের নকশাকৃত বাংলাদেশের বিপ্লবী পতাকা উত্তোলন করেন আবদুর রব। পাকিস্তান ভাঙ্গার দুঃসাহসিক সভামঞ্চে লেখকের উপস্থিতি, সেদিন বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে ফেলার সুগম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যে কারণে লেখকের জন্মগ্রাম গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন রাঙ্গামাটিয়া খ্রিস্টান ধর্মপল্লীটি কেন্দ্রিয় সরকারের দৃষ্টিতে পাকিস্তান বিরোধী বলে চিহ্নিত হয় এবং ২৬ নভেম্বর, পাক বাহিনী গ্রামটিতে হামলা করলে ১৩৭টি বাড়ী ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। পাঞ্জাবী দস্যুরা সেদিন ১৭ জনকে হত্যা করে এবং ১৪ জনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করা হয়েছিল।

৩ মার্চ, পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সভায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ ঘোষিত ৭ মার্চ এর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" উপস্থিত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত "জয় বাংলা" স্লোগান বাংলার আকাশ-বাতাস সেদিন বিপ্লবের বারুদে উত্তপ্ত করে তোলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ঘোষণায় বাংলার সাধারণ মানুষ মুক্তি পাগলে পরিণত হয়। একই সাথে গোটা দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র স্থবির হয়ে পড়ে। বিপ্লবী ছাত্র নেতাদের স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অতঃপর, ছাত্র নেতাদের নির্দেশে ২৩ মার্চ, গণপ্রজাতন্ত্র দিবসে ঢাকাস্থ সকল কূটনৈতিক ভবনে, বিপ্লবী পতাকা উত্তোলন করা হয়। একই সাথে সরকারী প্রহসন নাটকের সর্বশেষ যাত্রায়, ঢাকায় বঙ্গবন্ধু-ভুট্টোর সমঝোতার বৈঠক আরম্ভ হয়। ২৫ মার্চ বিকেলে চূড়ান্ত বৈঠকের ব্যর্থতার বার্তা নিয়ে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ঢাকা ত্যাগ করলে, রাতের আঁধারে জঙ্গি সেনাবাহিনী ছাত্র জনতা, নিরীহ ঢাকাবাসী ও পিলখানা বিডিআর বাহিনী এবং রাজারবাগ পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। দিবাগত রাতে বঙ্গবন্ধুকে তার ধানমন্ডিস্থ বাসভবন থেকে বন্দি করতে গেলে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার ঘোষণা দেন।

মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে জঙ্গি পাকবাহিনী, অগণিত নিরীহ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। গণহারে লুটপাট ও বাসস্থানে অগ্নি সংযোগ করে সম্পদ বিনাশ করে। দস্যুদের নির্মম আঘাতে নিরপেক্ষ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও সে থাবায় রক্ষা পায়নি। দেশ, জাতি ও আপনজনদের রক্ষায় অতঃপর, এরাও দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অধিকাংশ যুবকরাই ভারতে প্রবেশ করে যুব শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পেশাদার পাক-সেনাদের সাথে হালকা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। অতঃপর, অস্ত্র জমা দেবার পর বিপর্যস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের করুন দশায় রাষ্ট্র বা সংস্থার পক্ষে কেউ এদের পুনর্বাসন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে বেকার মুক্তিযোদ্ধাগণ অনেকেই অপরাধ জগতে হারিয়ে যান। অনেকেই চাকুরীর সুবাদে, প্রবাসে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন। সামাজিক অবহেলার কারণে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান নামে সরকার স্বীকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশঃ বিনাশ হয়ে যেতে থাকেন।

জাতি মহান স্বাধীনতা লাভ করেছে বটে! স্বপ্নের সোনার বাংলা অদ্যাবধি আমরা গড়তে পেরেছি কি-না, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রমনার আর্চবিশপ ভবন চত্বরে সম্মিলিত খ্রিস্টীয় সমাজের পক্ষে প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকালে, তৎকালিন আইনমন্ত্রী ও সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভূমিকা তুলে ধরার উদ্দেশে মি: টি,ডি, রোজারিও এবং চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরুকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়ায়, "মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভূমিকা" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি নিজে বাঙ্গালি খ্রিস্টান ও আদিবাসীদের পাশে ভিনদেশী যাজক, কূটনীতিক ও সাহায্য সংস্থার অবদানসহ এ্যাংলো পাকিস্তানীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছিলাম। স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে ১৯শত খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধার একটি তালিকাও হস্তান্তর করেছিলাম। স্বীকৃতিবিহীন স্বদেশী খ্রিস্টান বীর সন্তানদের সংখ্যা প্রায় ২২ শত হলেও অদ্যাবধি এর কোন তালিকা প্রস্তত করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির সর্ব প্রথম দেশীয় আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস এ গাঙ্গুলি সিএসসি ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের একজন অন্যতম সমর্থক এবং অদৃশ্য চালক। সে যুগের সৎ এবং সাহসী, আদর্শবান একজন মহাপুরুষ, খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের স্বচ্ছ একটি আয়না এবং একজন আদর্শ সমাজ নির্মাতার সীমাহীন সুনাম ছিলো তার। তিনি ছিলেন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ভাওয়াল ক্যাথলিক শিক্ষা সংঘ, আঠারোগ্রাম কল্যাণ সমিতি, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, সুহৃদ সংঘ, ত্রিবেণী ছাত্র কল্যাণ সংঘ ভাওয়াল খ্রীষ্টান যুব সমিতি এবং খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের প্রধান উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক। আর্চবিশপ মহোদয়ের আচরণে এদেশের সাধারণ মানুষ আজীবন তাঁকে একজন জীবন্ত সাধুর মর্যাদা দিয়েছেন।

বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠায় পর্তুগীজ মিশনারীদের প্রাথমিক ভূমিকা থাকলেও নতুন ধর্ম প্রচার ও প্রসারে একক কৃতিত্বের অধিকারির নাম দোম আন্তনিও দা' রোজারিও। অজানা কারণবশতঃ ভূষণার রাজপুত্রের ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বটে! অদ্যাবধি তার পিতৃ পরিচয় এবং আদি নাম জানা যায়নি। বিভিন্ন তথ্যমতে ভূষণার রাজা সীতারাম রায়কেই তাঁর পিতা বলে অনুমান করা হয়। অবহেলিত ইতিহাসের বদ্ধ গুহায় হারিয়ে যাওয়া তথ্যে, পাঁচশত বৎসর পূর্বে খ্রিস্টধর্ম প্রচার হলেও ১৬ শতাব্দি থেকেই এদেশে প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জানা যায়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ভূষণা রাজ্য পদ্মায় বিলিন হয়ে গেলে সর্বহারা খ্রিস্টভক্তদের একাংশ ভাওয়াল পরগনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। বোম্বের প্রশিক্ষণ শেষে দোম আন্তনিও, তৎকালিন ফরিদপুরের হরিকুল-লড়িকুল মৌজায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার কাজ আরম্ভ করার পর ১৬৬৬-৬৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র দুই বৎসরে ৩০ হাজার স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণবাদের কারণে দীক্ষাকৃত আন্তনিও নতুন খ্রিস্টভক্তগণ ধর্মান্তর বাদের প্রাথমিক স্তর থেকেই পর্তুগীজ বংশপদবী ধারণ করতঃ তৎকালিন বঙ্গদেশে নতুন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলতঃ

সাম্রাজ্যবাদী আঘাত সামাল দেবার অদৃশ্য কারণে, ভিনদেশী যাজকগণ দেশীয় খ্রিস্টভক্তদের রাজনীতি থেকে আলাদা পরিগুলের অবস্থানে রাখার কৌশল অবলম্বন করতো। বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদে সমর্থন থাকায়, মণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত দেশীয় খ্রিস্টভক্তগণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, আগামী প্রজন্মকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাতে স্বক্ষম হয়েছেন। উপনিবেশবাদের সমালোচনায় জাগ্রত মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সর্বশেষ সরকারি কৌশল ছিলো অপরাধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা। খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন কারাগার না থাকায়, অন্যায়কারীকে গির্জায় উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের সামনে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো গুরুতর অন্যায় হলে প্রবেশদ্বারে, অপরাধির কপালে ছাই নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হতো। শাস্তির বিশ্লেষণ সাপেক্ষে অপরাধিকে জরিমানাও করা হতো। পারিবারিক কলহ দমাতে দম্পতিকে আলাদা করারও প্রচলন ছিলো। যাজকদের অনাচার প্রকাশ হলে, মণ্ডলীর ন্যায় বিচারে তাকে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা থেকে বিরত রাখা হতো। মণ্ডলীর অনুমোদন ছাড়া সামাজিক কোন সংগঠন গড়া যেতোনা। স্থানীয় প্রশাসন চালাতে পাল পুরোহিতের ভূমিকা ছিলো মুখ্য। সমাজে কারো পক্ষেই কোন ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানো সম্ভব ছিলোনা। স্পষ্টবাদীতে বা স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে পাগল আখ্যা দিয়ে সমাজ গঠনের সকল ক্ষেত্রে তাকে বঞ্চিত রাখা হতো। এ বিষয়ে স্বদেশী আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর আবির্ভাব না ঘটলে, বিপ্লবী যুগের ছাত্র-যুব সমাজ হয়তো দম আটকে নিঃশেষই হয়ে যেতো। জন্মসূত্রে বঙ্গবন্ধু এবং আর্চবিশপ একই যুগের সন্তান থাকায় হয়তো, আমরা রাজনীতির সকল বাধা অতিক্রম করে মহান মুক্তিযুদ্ধে, বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিলাম এবং পরিবর্তনের ধারায় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর স্পর্শে সংগঠকের ভূমিকায় আমরা অনেকেই নেতৃত্বের জগতে আত্মপ্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলাম।

নতুন প্রজন্মের ছাত্র-যুব সমাজ তৎকালিন রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও মেধা বিকাশের সুযোগে, দেশব্যাপী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদে অনেকেই নির্বাচিত নেতায় পরিণত হয়েছেন। এরা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাবে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও তাবেদারীদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে পড়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে, বেকার ও উপার্জনহীনতায় পরিণত হতে হয়েছে। নিরুপায় হয়েই এরা আত্মরক্ষার্থে এবং প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই বাধ্য হয়েই অপরাধজগতে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। অপর দিকে ভিনদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো, স্থানীয় মণ্ডলীর সুপারিশে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের রহস্যজনকভাবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বটে! নীরিহ সাধারণ ও তাবেদারদের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এদেরকে ডেকে এনে দ্বিগুণ বেতনে চাকুরী দেওয়ার কারণে, সমাজে দরিদ্র ও নব্যধনী শ্রেণিতে দু'টি মারাত্মক ভাগের সৃষ্টি হয়। সাহায্য সংস্থায় প্রচুর অর্থের স্রোতে সমাজে দারুণভাবে অনিয়মের সংস্কৃতি মাথাচড়া দেয়। দুর্নীতির প্রশ্রয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে নতুন ধনিব্যক্তির জন্ম হতে থাকে। অপক্ষমতার দাপটে এবং অর্থাভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধারা সামাজিক অবহেলায় হারিয়ে যেতে থাকেন। অবৈধ উপার্জনে নব গঠিত স্বচ্ছল গোষ্ঠীর অপপ্রভাবে এবং অবক্ষয়ের কারণে সমাজের সর্বস্তরে নৈতিকতার সংস্কৃতি শিথিল হয়ে পড়ে। সৎ শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তিরা নেতৃত্বের মঞ্চ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েই ঘরে বসে পড়েন। উন্নয়নের রাজনীতিতে লোভী, স্বার্থপর দুর্নীতিবাজদের চুম্বকীয় মধ্যাকর্ষণ শক্তির অপপ্রভাবে দুর্ভাগ্যজনকভাবেই সমাজে দুর্নীতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ন্যায্যতার শ্লোগান ও আকার্ষণীয় পোষ্টারের অন্তরালে, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্ব কবজাকৃত করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে নবীন নেতৃত্বের আগমন স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যায়, অনাচার, অসামাজিক কর্মকান্ড, চুরি মাদকতার জোয়ারে অতীতের আদর্শ, ভদ্র আচরণ ও খ্রিস্টীয় চেতনার অকল্পনীয় বিনাশ বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বচক্ষে দেখে যেতে হলো। পূঁজিবিহীন পোদ্দারীর অপসংস্কৃতি, সুনাম অর্জনকারী, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বে, চিরস্থায়ী ব্যক্তিত্বের অপছায়া বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় সমাজ কে ধ্বংস করে দিয়েছে। ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের মাথায় পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষমতালোভী, দুর্নীতি পরায়ণ ও মুখোশধারী স্বঘোষিত নেতাদের অবস্থান, নতুন সমাজ গড়ায় বর্তমান সমাজ মারাত্মক বাঁধার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাস্তবতাকে শেখ হাসিনা সরকার স্বীকৃতিদানে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, অবহেলিত ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছেন বিধায় মুক্তিযোদ্ধাগণ স্বস্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেলছেন। ইতিহাসের অবমূল্যায়নের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে জীবনের শেষ সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেও গর্ব বোধ করি বটে! কিন্তু দুঃখভরা মনে স্মৃতিচারণ করতে হয় মহা গৌরবের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে এর বিনাশ ঘটাতেও হাতেগনা, কতিপয় খ্রিস্টান নেতার মানসিকতার কেন পরিবর্তন হচ্ছে না! স্বঘোষিত হিরো প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে কি এরা, ইতিহাসের হিরোদের জিরো করা যায়না বলেই তাহলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এতো ক্ষোভ!

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ক-২৯, সরকার বাড়ী (নীচতলা), নদ্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
স্থাপিত: ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং: ০০৮৯৪/২০০৭

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৯ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৩০তম মাসিক বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১০ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শুক্রবার, সমিতির অস্থায়ী কার্যালয়: ক-২৯, সরকার বাড়ী (নীচ তলা), নদ্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে।

অতএব, উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

আগস্টিন কস্তা
সভাপতি
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

দিপালী কস্তা
সম্পাদক
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

তোমরা সাপের মতো সাবধানী হও

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

পবিত্র বাইবেলে আমরা সাপ বা সর্পের নানা বিবরণ দেখতে পাই। সাপকে বলা হয় ধূর্ত, চালাক, বুদ্ধিমান প্রাণী। সাপের এই গুণের কারণেই যিশু বলেন, *"তোমরা সাপের মত সাবধানী হও (মথি ১০:১৬)।"* কোন কোন বাইবেল অনুবাদে বলা হয়েছে, সাপের মত বুদ্ধিমান হও, চতুর হও, চালাক হও, সতর্ক হও প্রভৃতি। বাইবেলের আদিপুস্তক গ্রন্থের সৃষ্টিকাহিনীতে বলা হয়েছে, ঈশ্বর যে সমস্ত বন্যজন্তু সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সেই সাপই একদিন নারীকে বলেছিল, *"পরমেশ্বর নাকি তোমাদের বলেছেন, তোমরা এই বাগানের কোন গাছের ফল খাবে না... তোমরা মোটেই মরবে না! এমনকি পরমেশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাব আর তোমরা পরমেশ্বরের মত হয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান লাভ করবে (আদি ৩:১-৫)।"* পরে ঈশ্বর সর্পকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কারণ সে নারীকে (হবা) প্রলোভন দেখিয়ে পাপে ফেলেছিল। তাই সাপকে শয়তান বা মন্দতার প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়, *"তিনি এসে নাগদানবটাকে অর্থাৎ সেই আদিম সাপ, যার নাম দিয়াবল বা শয়তান, তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে এক হাজার বছরের জন্যে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন (প্রত্যাদেশ ২০:৩)।"* যাত্রাপুস্তকে পাই, ঈশ্বরের আদেশে মোশী তার হাতের লাঠি মাটিতে ফেলা মাত্রই সাপ হয়ে গেল। আবার সাপের লেজে হাত দেওয়া মাত্রই লাঠি হয়ে গেল *(যাত্রা ৪: ২-৫)*। কিন্তু এই সাপকে/সর্পকে আবার উঁচুতে তোলা হয়েছে। ইস্রায়েল জাতি যখন ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিল এবং মোশী ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল, তখন ঈশ্বরের আদেশে সাপ এসে অনেককেই ছোবল দিয়েছিল। কেউ কেউ মারা গিয়েছিল। তখন মোশী লোকদের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আবার প্রার্থনা করেছিলেন। আর মোশীকে ঈশ্বর বলেছিলেন, *"তুমি একটা সাপ তৈরী করে তা একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগাও; যাকে সাপে কামড়িয়েছে, সে এই সাপের দিকে তাকালে বাঁচবে (গণনা ২১৮-৯)।"* যাকে যাকে সাপে কামড় দিয়েছে ঈশ্বরের নির্দেশে সর্পমূর্তির দিকে তাকালেও তারা ভাল হয়ে যেত (গণণা পুস্তক ২১:৪-৯)। ঠিক তেমনি ভাবে যিশুকেও উঁচুতে তোলা হবে। *"মোশী যেমন মরুভূমিতে সেই সর্পমূর্তি উঁচুতে তুলে রেখেছিলেন, তেমনি মানবপুত্রকেও একদিন উঁচুতে তোলা হবেই (যোহন ৩:১৪)।"*

ঈশ্বর নির্ভরশীল লোকদের ঈশ্বর সমস্ত বিপদ-আপদ, মন্দতা থেকে রক্ষা করেন। কেননা ঈশ্বর বলেন, *"চন্দ্রবোড়া কেউটের ওপর পা ফেলেই চলতে পারবে তুমি; যুবসিংহ অজগর দু'পায়ে মাড়িয়ে যাবে তুমি (সামসঙ্গীত ৯১: ১৩)।"* শুধু তাই নয়, *"তাঁরই হাত কুটিল সাপকে বিঁধিয়ে দেয় (যোব ২৬:১৩)।"* যিশু বলেন, *"তারা হাতে ক'রে সাপ তুলবে আর মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোনক্ষতি হবে না (মার্ক ১৬:১৮)।"* তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিষ্যচরিত গ্রন্থে। সাধু পল মাল্টা দ্বীপে নামার সময় একটা বিষাক্ত সাপ তার হাত কামড়ে ধরেছিল *(শিষ্য ২৮:৩-৫)*। কিন্তু পলের মৃত্যু হয়নি।

বাইবেলের নবসন্ধিতে সাধু মথির মঙ্গলসমাচারে দেখতে পাই, *"কাল-সাপের জাত"* শব্দের ব্যবহার *(মথি ৩:৭, ২৩:৩৩)*। অপরদিকে যিশু বাণীপ্রচারকদের উদ্দেশ্যে বলেন, *"তাই তোমরা সাপের মতো সাবধানী হও, অথচ পায়রারই মতো সরল হও (মথি ১০:১৬)।"* যিশু বর্তমান যুগের খ্রিস্টানদের সাপের মতো সাবধানী হওয়ার জন্য, বুদ্ধিমান, চতুর, চালাক হওয়ার জন্য বলছেন। কারণ এই বুদ্ধির জন্যই সাপ এখনও বেঁচে আছে, এই বুদ্ধির জন্যই সাপ টিকে আছে, তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কত সরিসৃপ প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে সাপ এখনও বেঁচে আছে, এখনও টিকে আছে।

মনে করি, সর্পজাতি বড় বুদ্ধিমান প্রাণী, নইলে তারা একে বেঁকে চলে কেন? কথা প্যাচ দিয়ে বুদ্ধিমানেরাই বলে। সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে বুদ্ধিমানেরাই বাঁকা আঙ্গুল ব্যবহার করতে জানে। বাঁকা উঠানেও নাচতে পারে।

সতর্ক দৃষ্টি রাখা

সাপ সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করে। বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবসময় সতর্ক হয়ে চলে। গোখরা সাপ ফণা তুলে অন্যকেও সতর্ক করে। তেমনিভাবে আমাদেরও সতর্ক হয়ে চলতে হবে যেন বিপদে না পড়ি, যেন প্রলোভনে না পড়ি। বর্তমান যুগে একটু বেখেয়ালি হলে, অসাবধানী হলেই টিকে থাকা কঠিন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিক্ষণেই সতর্ক হয়ে চলতে হবে, এগিয়ে চলতে হবে। বাসে উঠেন, ট্রেনে চড়েন, লঞ্চে উঠেন যেখানেই চলাচল করেন না কেন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সাপকে প্রায় সবাই ঘৃণা করে তবু সে বেঁচে আছে

সাপকে বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ সকলে তাকে ঘৃণা করলেও, সে সকলের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে। সাপকে প্রায় সবাই ঘৃণা করে তবু সে বেঁচে আছে। সাপকে দেখলে অনেকেই মেরে ফেলতে চায়। তবু সে মানুষের ঘৃণাকে জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অনেকের কাছে সে ভালবাসা পায়, এমনকি পূজাও পায়। কেউ তাকে দুধ কলা খাইয়ে পুষছে। আর তুমি আমি কারো ঘৃণার পাত্র হলে, অবহেলার পাত্র হলে কিংবা যদি কেউ ভাল না বাসে তবে ভালবাসার অভাবে মরে যেতে চাই। অনেকেই খাদ্যের অভাবে নয়, বরং ভালবাসার অভাবে মারা যায়। গলায় দড়ি দেয়, হতাশা নিরাশায় নিজেকে ধ্বংস করে। কিন্তু সাপ তা করে না।

সাপ খাপ খাইয়ে চলে

সাপকে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করার আরেকটি কারণ হল খাপ খাইয়ে চলতে পারা। সাপ যে কোন পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে। জলে, স্থলে, গাছে বিচরণ করতে পারে। আপনি দেখবেন যে, আধুনিক জগতে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমনকি মানব জাতির কোন কোন জাতি-গোষ্ঠিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সাপ এখনও সমস্ত সংকটের মধ্যেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আসলে বুদ্ধি থাকলে সবার সঙ্গে চলাফেরা করা যায়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র, পাপী-সাধু সবার সঙ্গে চলা যায়।

আত্মশক্তি কাজে লাগাতে পারে

সাপের মধ্যে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার পা নেই, তবু সে চলতে পারে, হাত নেই তবু সে গাছে উঠতে পারে, তার কান নেই, তবু সে শুনতে পারে। আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চলতে পারে সে গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, চলাফেরা করতে পারে। আর আমাদের হাত আছে, পা আছে, চোখ-কান আছে তবু আমরা প্রতিবন্ধী। যারা সাপের মত আত্মশক্তি কাজে লাগাতে পারেন, তারাই বেঁচে থাকেন, তারাই টিকে থাকেন। যেমন; ঝাড়খন্ডের সোনাঝরিয়া মিন্জ তার উদাহরণ। তাকে শৈশবে বলা হত-তোমার দ্বারা কিছু হবে না, তুমি কিছুই পারবে না। কারণ ইংরেজিতে ভালভাবে কিংবা ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারতো না। কিন্তু সেই মেয়েটিই ভারতের সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছে। তেমনি জগতে চলতে গেলে আমাদের মধ্যে যে আত্মশক্তি আছে তা কাজে লাগাতে হবে।

লক্ষ্য অর্জন করতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা

সাপ বুদ্ধিমান প্রাণী কারণ তারা এই পৃথিবীতে তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। অজগর সাপ সোজা হয়ে শুয়ে থাকে। তাকে দেখলে মনে হবে শক্তিহীন। কিন্তু শিকার ধরতে গেলে দেখতে পাই, সে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে। আস্ত হাতি গিয়ে ফেলে, হরিণ শিকার করে, শিং হজম হয়ে যায়। অনেক প্রাণী তার বিপক্ষে থাকলেও সে এখনও বেঁচে আছে, খাবার খাচ্ছে এবং বংশ বৃদ্ধি করছে। আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার বাড়ির আশে পাশে সিংহ, বাঘ, হাতির মত বড় বড় প্রাণী নেই। কিন্তু প্রায় অঞ্চলেই সাপের উপস্থিতি রয়েছে। বাঘ, সিংহ, হাতি এলাকাতে থাকতে পারে না। কারণ তারা সাপের মত সব স্থানে বিচরণ করতে পারে না, সব পরিবেশে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না, সব পরিবেশে খাদ্য যোগার করতে পারে না, সাবধানী হতে পারে না, বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে না। তাই তাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কিন্তু সাপ প্রত্যেকটা এলাকাতেই থাকতে পারে, সেই ভাবে নিজেদেরকে সক্ষম করে তুলেছে।

সহায়িকা: বিশপ ড্যাগ হিউয়ার্ড-মিলস রচিত সর্পের মত সতর্ক হবার অর্থ কি, ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত তথ্য।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় জানমালে কতটুকু নিরাপদ

যোসেফ শরৎ গমেজ

বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাথে আমরা খ্রিস্টান জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সংবিধানের মূল চারনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে '৭১ এ অন্য সকলের সাথে আমরা খ্রিস্টান জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিস্টানদের অবদান কম ছিল না। দূর্ভাগ্যের বিষয় '৭৫ এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের রাজনীতিসহ সার্বিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়। '৭৫ এর পরে যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে তারা সংবিধানের চারনীতি পরিবর্তন করে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে মুসলিম বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। ফলে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হতে হতে অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। ভারতে চলে যাওয়া এই হিন্দু পরিবারগুলোর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অনেকেই লুটপাট হয়ে যায়। আবার অনেক সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। যা পরে অর্পিত সম্পত্তির গ্যারাকলে আটকে পড়ে। বাংলাদেশে কোন খ্রিস্টান পরিবার '৭১ বা '৭১ এর পরে দেশ ছেড়ে ভারতে যায়নি। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক জন্মগতভাবে এ দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম জনগণের যতখানি অধিকার আছে খ্রিস্টানদেরও ততখানি অধিকার আছে।

প্রায় ৫ শত বছর ধরে বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের বসবাস। বৃটিশ সরকারের আমলে বহু খ্রিস্টান ভারতে গিয়ে চাকুরী করেছে। তাদের কেউ কেউ ভারতের পশ্চিম বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের বিষয় সম্পত্তি যা তারা বাংলাদেশে রেখে গেছে তাদের ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ভোগ দখল করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার সেই সব সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির আইনের মধ্যে টেনে আনে। ফলে বহু খ্রিস্টান পরিবারের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির গ্যারাকলে পড়ে যায়। বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত বহু বাঙালি খ্রিস্টান পরিবার বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে পাড়ি দিয়েছে। তাদের অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অনেকে চাকুরীর সন্ধানে আবার অনেকে ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে সেইসব দেশে দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করে আসছে এবং তারা অনেকেই সেইসব দেশের নাগরিকত্বও লাভ করেছে। অথচ তারা যে বিষয় সম্পত্তি বাংলাদেশে রেখে গেছেন যা তাদের আত্মীয়স্বজন ভোগ দখল করে আসছে। তাদের সেইসব সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকার অর্পিত সম্পত্তি বা শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেনি। তারা মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসছে আত্মীয়স্বজনদের সাথে বসবাস করছেন আবার কেউ কেউ বিষয় সম্পত্তি বেচা-কেনাও করছে। অথচ যেসব পরিবারের সদস্য ভারতে আছে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকার অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় নথিভূক্ত করেছেন। যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে, ভারতে চলে গেছে তাদের জন্য যে আইন তৈরি করেছে সেই আইনের আওতায় ফেলে দিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে বসবাসরত খ্রিস্টান জনগোষ্ঠির জীবনে এক অভিশাপ নেমে এসেছে।

সরকারী আইন আমাদের সকলেরই মানতে হবে। আইনের বাইরে কেউ নয়। কিন্তু সেই আইন ন্যায্য আর যুক্তি সম্মত হতে হবে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে বাংলাদেশের অর্পিত সম্পত্তির আইনের মত আইন আছে? বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সরকারের এই অদ্ভুত আইন মেনে নিয়ে অর্পিত সম্পত্তির লিজের খাজনা প্রণামীসহ প্রতি বছর পরিশোধ করে সম্পত্তি ভোগ করে আসছে এই আশায় যে একদিন এই অদ্ভুত আইন বিলুপ্ত হবে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বঙ্গবন্ধুর গড়া আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসবে। সেইদিন আমাদের ভাগ্য ফিরবে।

বিগত ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন আমরা আশায় বুক বাঁধলাম। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম বিগত সরকারের এই অদ্ভুত আইন অর্পিত সম্পত্তির গ্যারাকল থেকে মুক্তি পাব। আমরা আমাদের সন্তান সন্ততি ও ভবিষ্যত বংশধরদের নিয়ে নিশ্চিন্তে শান্তিময় নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারব। কিন্তু দেখা গেল দীর্ঘ ১৪ বছর আমাদের জীবনের চাকা তো ঘুরেই নাই বরং আরও অনিশ্চিত জীবনের গহ্বরে আমাদের ঠেলে দিয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনগণ যারা অর্পিত সম্পত্তির গ্যারাকলে পরে আছে তারা তাদের সম্পত্তির কোন খাজনাই সরকারকে দিতে পারছে না। সরকার তাদের কোন খাজনাই নিচ্ছে না। অর্পিত সম্পত্তির আইন হওয়ার পর দুইভাবে খাজনা দেওয়া হতো। যতটুকু সম্পত্তি অর্পিত আছে তার খাজনা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির খাজনা আলাদা আলাদাভাবে দিয়ে আসছে। এখন কোন খাজনাই সরকার নিচ্ছে না। কেন নিচ্ছে না তার কারণ জানা যায়নি। সরকারী আইন মতে কোন সম্পত্তি যদি অর্পিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হয় তবে সরকারের কাছ থেকে সেই সম্পত্তির কো-শেয়াররার যিনি আছেন তার কাছে সরকারী নোটিশ যাবে। প্রয়োজনে সরকারী লোক উপস্থিত হয়ে যাচাই বাছাই করে জানবেন যার সম্পত্তি অর্পিত হচ্ছে তার সেই জমিটা কোথায় অবস্থিত এবং দলিলপত্র দেখে নিশ্চিত হবেন প্রকৃতপক্ষে সে কতটুকু সম্পত্তির মালিক। সরকার তো জানেই না ভিক্টিমের সম্পত্তি কতটুকু এবং কোথায় অবস্থিত।

এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় দিন যাপন করছে। আর আশা করছে ভবিষ্যতে সরকার যদি দয়াপরবেশ হয়ে এই অর্পিত সম্পত্তি যাদের নামে আছে তাদের কাছে ছেড়ে দেন। তখন অনেকেরই সামর্থে কুলাবে না দীর্ঘ দিনের খাজনা আর প্রণামী দিয়ে সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার। তবুও আমরা আশায় আছি।

আমরা খ্রিস্টান জনগণ বাংলাদেশের যেখানেই বসবাস করি সংঘবদ্ধভাবে বাস করি। কারণ আমরা শান্তিপ্রিয় সুশৃঙ্খল জাতি। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আঠারগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ৮ হাজার খ্রিস্টান জনগণ বসবাস করছে তিনশত বছর ধরে। অর্পিত সম্পত্তির বোঝা মাথায় নিয়ে দিন যাপন করছে ৬০ শতাংশেরও বেশি পরিবার। বর্তমানে আমরা আমাদের কোন সম্পত্তি বিক্রি করতে পারছি না ছেলেমেয়ে অথ বা ভাই-বোনদের মাঝে দানপত্রও করে দিতে পারছি না। আমরা কবে এই অর্পিত সম্পত্তির বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাব সেই আশায় দিনগুনছি। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন এই মুক্তির দিনটি দেখার আশায় থেকে থেকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে আমরা কি আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি না?

আমাদের খ্রিস্টান নেতা-নেত্রী ও ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে ... ? আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটা বিষয় জেনেছি ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছি বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের অর্পিত সম্পত্তির প্রকৃত বিষয়গুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন না। মূল বিষয়গুলো তাঁর কাছে তুলে ধরতে পারলে এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি॥

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে আলো ছড়ানো এক নক্ষত্র যেরোম ডি কস্তা

ডাঃ নেভেল ডি রোজারিও

পাকিস্তানের ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরনকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসককূলে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। বাতিল করা হয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। বাংলার আপামর জনতা ফুলে উঠে প্রতিবাদে। শুরু হয় শেখ মুজিবুরের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঢাকায় এসে আলোচনার নামে কাল ক্ষেপণ করে "Operation Searchlight" অভিযানের আদেশ দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট থেকে প্রতি শুক্রবার একটি স্বাধীন ইংরেজি ভাষায় Weekly Holiday সাপ্তাহিকী হিসেবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান প্রতিষ্ঠিত, এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংবাদপত্র গুলির মধ্যে একটি এবং ধারাবাহিকভাবে পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে স্পষ্টবাদী অবস্থানের জন্য সবমহলে সুপরিচিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের সে কাল-রাত্রিতে যেরোম ডি কস্তা সাপ্তাহিক হলিডের খণ্ডকালীন কর্মচারী হিসেবে রাতে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পরিচালিত 'Operation Searchlight' এ'র আক্রমণে English Weekly Holiday অগ্নিকান্ডের শিকার হলেও ঈশ্বরের কৃপায় সেদিন রক্ষা পেয়েছিলেন আমাদের আজকের যেরোমদা।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ঢাকার গড়ে উঠে আন্তঃমাণ্ডলিক খ্রিস্টান যুব প্রতিষ্ঠান 'সুহৃদ সংঘ'। সে সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানের কাথলিক মণ্ডলীর কোথাও আন্তঃমাণ্ডলিকতার কোন ধারণা দেখা যায়নি। বরং সবাই মনে করতো বা ছোটকাল থেকে ধারণা দে'য়া হতো যে কাথলিক ছাড়া অকাথলিকরা খ্রিস্টানই নয়। শহরের বেশির ভাগ খ্রিস্টানের চালচলনে প্রকাশ পেত যেন ভিনদেশী। এ হেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ও বিপরীতমুখী চিন্তা নিয়ে এগিয়ে এসে গড়ে তুললো ঢাকার আন্তঃমাণ্ডলিক খ্রিস্টান যুব প্রতিষ্ঠান 'সুহৃদ সংঘ'। সাধারণ সভায় উপস্থিত সুহৃদবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে সুহৃদ যেরোম ডি কস্তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধর্মীয় সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে। সুহৃদ সংঘের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমারও সুযোগ হয় দাদার কাছাকাছি আসার ও আরও ভালভাবে যেরোমদাকে জানা ও চেনার।

ভবিষ্যতে পুরোহিত হওয়ার মানসে সেমিনারীতে যোগ দিলেও যেরোমদা ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পুরোহিত গঠনগৃহ (Seminary) ত্যাগ করেন। দেশে স্নাতক ডিগ্রি শেষে যেরমদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ১-বছর ব্যাপী Diploma Course ভর্তি হন এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে উত্তীর্ণ হন। সে সময় সারা বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংবাদিকতার উপর Diploma কোর্স শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে যেরোম ডি কস্তা কাথলিক দাতব্য সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন।

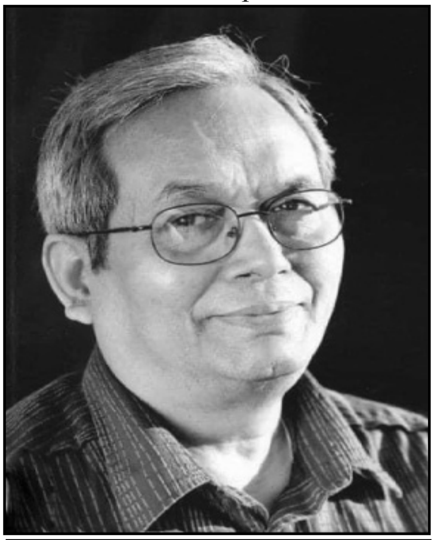

প্রয়াত যেরোম ডি'কস্তা

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি'র একটি ইচ্ছে ও পরিকল্পনা ছিল সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের মাঝ থেকে প্রতিবেশী পত্রিকাটির জন্যে জনবল তৈরি করার এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিবেশী পত্রিকাটি খ্রিস্টভক্তদের দায়িত্বে দেবার। প্রতিবেশী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যেরোম ডি কস্তাকে গড়ে তোলার জন্যে CSC Congregation এর বিশেষ স্কলারশীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। অরেগন অঙ্গরাজ্যের Portland University তে Communication Arts অধ্যায়ন শেষে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে যেরোম ডি কস্তা দেশে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি হঠাৎ করে মারা যান। খ্রিস্টভক্ত সুহৃদ, পরবর্তীতে পোপ বেনেডিক্ট কর্তৃক 'ঈশ্বরের সেবক' ঘোষিত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পরে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেখা দেয় অচলাবস্থা, দীর্ঘসূত্রিতা ও অহেতুক কালক্ষেপণ। দেশে-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, সাংবাদিকতায় দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া স্বত্ত্বেও যেরোম ডি কস্তাকে প্রতিবেশী পত্রিকায় নিয়োগ দেয়া হলো সহকারী হিসেবে। অনেক খড়-কাঠ পুড়ানো শেষে অভিষিক্ত হলেন সম্পাদক পদে।

যেরোম ডি কস্তা ১৯৮২-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় কাথলিক প্রকাশনা (বাংলাদেশের একমাত্র চলমান ৮২ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাপ্তাহিক) প্রতিবেশী' পত্রিকায় প্রথমে সহ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি প্রতিবেশী পত্রিকার ৮২ বছরের প্রকাশনার ইতিহাসে অযাজকীয় (non-priest) সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র ব্যক্তি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবেশী পত্রিকার সম্পাদকের পদ পেলেও কিছু সংখ্যক পুরোহিত, পরামর্শক এবং কিছু সিনিয়র ষ্টাফরা শুরু করে অসহযোগিতা এবং কাজে প্রতিবন্ধকতা। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন পর্যায়ে পরামর্শ করেও কোন সমাধান না পাওয়াতে আশাহত ও হতাশায় সম্পাদক পদ থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। স্বল্পভাষী, নম্র ও বিনয়ী যেরোম ডি কস্তা এতটাই ব্যথিত, মর্মাহত ও হতাশাগ্রস্থ হয়েছিলেন যে তার নিজের পূর্ব কর্মস্থল কাথলিক সংস্থা CARITAS Bangladesh এ ফেরার চেষ্টা না করে উন্নয়ন সংস্থা World Vision, Bangladesh এ যোগাযোগ ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি WVB (World Vision, Bangladesh)- এর Associate Director হন। এর পর সপরিবারে কানাডাবাসী হন।

যদিও তিনি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন, তিনি সর্বদা মণ্ডলীকে সমর্থন করেছেন এবং করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। টরোন্টোতে অভিবাসী হয়ে বাঙালি খ্রিস্টানদের

এক মঞ্চে একত্রিত করার জন্যে গড়ে তুলেন Bangladesh Catholic Association of Ontario. যেরোম ডি কস্তা ছিলেন এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। তার আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মযজ্ঞ হলো "Bangladesh Canada and Beyond (News, Features, Opinion, Socio-Religious-Historical snippets & personal mussings). Blog, যেখানে এক নিমিষে পেতে পারেন বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের খবরাদি, পাবেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর খবরাখবর।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবশী প্রকাশনা থেকে যেরোম ডি কস্তা রচিত 'বাংলাদেশে ক্যাথলিক মন্ডলী' (বাংলাদেশে ক্যাথলিক চার্চ) নামে ৫৯৫ পৃষ্ঠার একখানা বই ফাদার জ্যোতি গমেজ প্রকাশ করেন। বইটি ১৬ শতকের শেষের দিকে পর্তুগিজ কাথলিক ধর্মপ্রচারকদের পূর্ব বাংলায় আগমন কাল থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পোপ ২য় জন পলের বাংলাদেশ সফর পর্যন্ত কাথলিক চার্চের ইতিহাস এবং এর বৃদ্ধির উপর বাংলায় লিখিত কোন সাধারণ খ্রিস্টভক্তের ইতিহাস ভিত্তিক মুদ্রিত প্রথম বই। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে তৎকালীন ঢাকা আর্চডায়োসিসসহ তখনকার বাকী ডায়োসিসাধীন বিভিন্ন ধর্মপল্লী, উপ-ধর্মপল্লী সমূহের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসসহ বিভিন্ন তথ্যাদি সন্নিবেশিত ছিল। যেরোম ডি কস্তার অমর গবেষণাধর্মী পুস্তক 'বাংলাদেশে

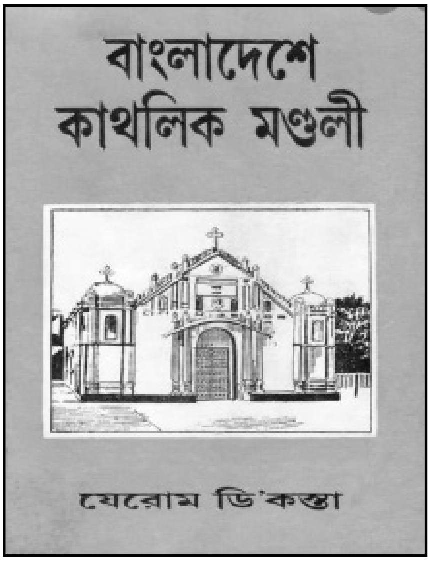

কাথলিক মন্ডলী"র বিপুল চাহিদা থাকা স্বত্ত্বেও, গত কয়েক দশক ধরে বইটি দুস্প্রাপ্য হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে এর ২য় সংস্করণ বের করা হয় নি। তার বইয়ের প্রথম খণ্ড দেশে-বিদেশে অনেকের লেখার রেফারেন্স হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতার প্রভু যীশুর গীর্জা থেকে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত লুইস প্রভাত সরকারের "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়" (Christianity and Christian Churches in Bengal (১৫৭৩-১৯৬০) Vol 1 এর কয়েকটি অধ্যায়ে যেরোম ডি কস্তার এ পুস্তকটি রেফারেন্স তালিকাভুক্ত আছে।

যেরোম ডি কস্তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৮ বছর জড়িত ছিলেন সাউথ এশিয়ান ক্যাথলিক প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি হিসেবে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই বছর এর সভাপতি ছিলেন।

তিনি আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক সংবাদ পরিসেবা UCA নিউজ এর বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান হিসেবে এবং ভারত-ভিত্তিক দক্ষিণ এশীয় ধর্মীয় সংবাদের জন্যও কাজ করেছেন।

ডি কস্তা তার জীবদ্দশায় অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান থিওলজি হ্যান্ডবুক, সেকেন্ড ভাটিকান কাউন্সিল ডকুমেন্ট---সামাজিক নির্দেশনা, বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের ভূমিকা, চার্লস ডি ফুকো, হিরো অফ দ্য ডেজার্ট, কাম টু জিসাস, পাওয়ার রিলেশনস ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট: বাংলাদেশ রিলেশনস॥

সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই শুভ বড়দিন ২০২২
এবং নতুন বছর ২০২৩ এর শুভেচ্ছা ও শুভকামনা

শুভেচ্ছান্তে
কর্নেল (অব:) যোসেফ অনিল ও মনিকা রোজারিও
ও মারভিন, মার্টিন-রিমি ও নাথান
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ভাঙ্গনের শব্দ শুনি

ডেভিড স্বপন রোজারিও

"ভিন্ন ভাতে বাপও একদিন পর হয়ে যায়" ছেলেবেলায় শোনা এ গ্রাম্য প্রচলিত কথাটি অনুভূতিকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। সাধারণত বিয়ের পর পরই ছেলের ভিন্ন হওয়ার কারণে, কথাটা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। একান্নবর্তী পরিবারগুলো যখন বিভিন্ন কারণে ভিন্ন হয়ে যায়, তখন রাতারাতি সব আপন মানুষগুলো, যারা দীর্ঘদিন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না একত্রে মিলেমিশে ভাগ করে নিয়েছিলো, তারা কেমন যেন পর হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি আঘাত পায়, অল্পবয়স্ক সন্তানেরা। কোন কিছু বোঝার আগেই, হাড়ি-চুলা, আলাদা হয়ে যায়। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে। যেমনটি হয়েছিলো, আমাদের সংসারে।

আমাদের বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে হঠাৎ ভাঙ্গন। রোববার একদিন তৃতীয় মিসার পর, বন্ধুরা মিলে উঠানে মার্বেল খেলছিলাম। দেখি গ্রামের মাতব্বররা একে একে আমাদের বাড়ি এসে ভিড় জমাতে লাগলো। এতোগুলো লোককে একে একে বারান্দায় বসতে দেখে বেশ পুলকিত হয়েছিলাম। অবশ্য এ বিষয়ে, বাবার গম্ভীর মুখ দেখে, কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। বোনদের একজন বিষণ্ণবদনে বললো, আমরা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছি। কোন কিছু ভালমত বুঝে উঠার আগেই আমাদের চোখের সামনে, প্রথমে হাড়ি-পাতিল, ধান-চাল, গরু বাছুর, ঘর-বাড়ি এবং পরে অবশ্য জমি-জমাও। এর কারণ তখন না বুঝলেও, পরে বড় হয়ে একদিন মার কাছে শুনেছিলাম যে, আমরা দশজন ভাই-বোনের এতো বড় সংসার আর জ্যাঠাতো ভাইরা তাদের মা সহ মাত্র তিন জনের সংসার। জ্যাঠাতো ভাই শহরে ভাল চাকরি করে, সে কেনো এতো বড় সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেবে? হিংসা মনে চেপে রাখতে না পেরে, একদিন বাবাকে বলেই ফেললো।

-কাকা, আমরা ভিন্ন হতে চাই। বাবা আশ্চর্য না হলেও মনের ব্যথা মনেই চেপে রাখে, তার দাবি মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলো না।

বাবা তার ভাতিজাকে বললেন, বেশ তুমি যা চাও, তাই হবে।

এমন অজস্র ঘটনা আছে যে, সামান্য কারণে যৌথ পরিবারগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তবে

ছবি: ইন্টারনেট

ছোট বেলায় দেখেছি, অনেক ছেলেরা বিয়ের পরেই ভিন্ন হতে চায়। অনেকে একে নতুন বউয়ের প্ররোচনা বলে সন্দেহ করে। শাশুড়ী বউয়ের মনোমালিন্য আজ সর্বজনবিদিত। ছেলেকে বশে রাখতে, শাশুড়ীর প্রাণান্ত চেষ্টার কারণে, বউয়ের হিংসাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, অশান্তি চরমে উঠে, নানা সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে এবং নিজেদের সুখ-শান্তির কথা ভেবেই একদিন আলাদা হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। শাশুড়ী-বউয়ের এ ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে, একটি মুখরোচক কৌতুক আছে যা নিম্নরূপ:

একদিন ক্লাশে, শিক্ষক মহোদয়, ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন - আচ্ছা বলতো, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে, কোন পরিবার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, সংসার করতে পেরেছিলো?

একটি ছাত্র হাত তুলে বললো, স্যার আমি বলতে পারি।

স্যার অবাক হয়ে বললো, কোন পরিবার?

ছাত্রটি মুচকি হেসে বললো, আদম-হবা।

স্যার বললেন, কেন কেন??

ছাত্রটি নির্বিকার চিত্তে বললো, কারণ, হবার কোন শাশুড়ী ছিল না।

তবে সবক্ষেত্রে একই সমস্যা হয় না, মধুর সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

বলাবাহুল্য, আগে পিসিমা বা বোনেদের ওয়ারিশ ভাগ করে নিতে, খুব কমই দেখেছিলাম। কিন্তু আজকাল জমি-জমা, অত্যন্ত মূল্যবান হওয়াতে, নানা অযুহাতে ওয়ারিশ নিয়ে নেয়া, নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে, মানবিকতার চেয়ে, নিষ্ঠুরতাই ফুটে ওঠে বেশি।

ওয়ারিশভাগের ব্যথা, আমিও পেয়েছিলাম। যখন কয়েক বছর আগে, পিশিমারা এক জোট হয়ে তাদের সব সম্পত্তি ভাগ করে নেয়। তাদের ভাগের সম্পত্তি তারা নেবে, এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু যাদের যায়, তারা হারে হারে টের পায়। কাউকে কষ্ট দিলে তাকেও কষ্ট পেতে হয়, সেটা আজ হোক-কাল হোক। সময় সব কিছুর জবাব দিয়ে দেয়। "এ পৃথিবীতে আত্মা বা রক্তের সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই! স্বার্থ যতক্ষণ, সম্পর্ক ততোক্ষণ। স্বার্থ শেষ, সম্পর্কও শেষ।"

আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবার ও সামাজিক এবং আর্থ-সামাজিক সংগঠনগুলো, কেমন জানি আজ একই সূত্রে গাঁথা। সর্বত্র একটি ভাঙ্গনের খেলা। কেউ কারো নেতৃত্ব মেনে নিতে চায় না,

ছলে বলে কলা-কৌশলে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার, নগ্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অনেকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সংগঠনের সংবিধান বা নিয়মনীতির ধার ধারে না, স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠে।

এরকম একটি ঘটনা ঘটে, আমি যে সামাজিক সংগঠনে, দশবছর যাবৎ জড়িত আছি। সামান্য নেতৃত্বের কোন্দলে, ২০১৮ তে, হঠাৎ একটি ভীষণ ঝড়ে আমাদের দীর্ঘদিনের সোহাদ্য-সম্প্রীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। অথচ শুরুতে সবকিছু নিয়ম-মাফিক হয়। নির্বাচন কমিশন গঠন এবং চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট প্রণয়ন ইত্যাদি সব কিছু সংবিধান মেনেই করা হয়। কিন্তু সামান্য একটা ইস্যুতে সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। ফলে ক্ষমতাসীন দল রাতারাতি অপর আরেকটি ইলেকশন কমিশন গঠন করে, নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। উপদেষ্টা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সকল আপোস আলাপ -আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ সবাই বিচার মানে কিন্তু 'তাল গাছটি হারাতে চায় না' যার জন্য সবকিছু অমীমাংসিত থেকে যায়। নির্ধারিত দিনে, দুটি নির্বাচন সম্পন্ন হয়, এমনকি ঘটা করে যার যার মতো, শপথ গ্রহণও করে ফেলে। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ক্ষমতা দখলে রাখতে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা ঠুকে দেয়। দুটি দলই, যার যার স্বপক্ষে জোরালো কাগজ পত্র জমা দেয়।

প্রথম দিনেই এটর্নী বলেন, এ কেস মীমাংসা হতে, দীর্ঘ সময় লাগবে, এমন কি এ ধরনের কেসে তেমন কোন অগ্রগণ্যতা নেই। কে শোনে কার কথা, ক্ষমতা দখলের লোভে, সবাই অন্ধ। তারপর প্রায় প্রতি সপ্তাহে কোর্টে দেখা হলে, নানা আজে বাজে মন্তব্য করতে কেউ ছাড়ে না। অবস্থা দিনকে দিন এতো খারাপ হতে লাগলো যে, শুধু গায়ে হাত তোলা বাকি রয়ে গেলো। উভয়পক্ষের প্রচুর ডলার খরচ হতে লাগলো।

অবশেষে, দীর্ঘ ছ'মাস পর, একদিন দুই এটর্নী তাদের চেম্বারে আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন - আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মীমাংসার কিছু অপশন দিচ্ছি, যদি মেনে নেও, তবে তোমাদেরই ভাল হবে। প্রথমত- সংগঠনকে দুটি ভাগ করে নিজেদের মতো করে নেতৃত্ব দাও সমস্যা হবে না। দ্বিতীয়তঃ যদি সংগঠনকে ভাগ করতে না চাও, তবে লটারী করো, যে জিতবে সে এক বছর নেতৃত্ব দেবে, অপর পক্ষ পরের বছর এবং পরে অবস্থার পরিবর্তন হলে, নির্বাচন দিলেই চলবে। তৃতীয়তঃ দুদল থেকে সমপরিমাণ সদস্য নিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে দল গঠন করতে পারো।"

আমরা তৃতীয় অপশনটা গ্রহণ করলাম। ফলে সমঝোতার মাধ্যমে সুন্দর একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হলো। সমিতি ভয়ংকর একটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেল। তাদের কার্যকাল শেষে নির্বাচন দিয়ে দিলো এবং নব নির্বাচিত কমিটি আজ সুন্দর নেতৃত্ব দিচ্ছে।

সব কিছু সুন্দরভাবে মিটে যাওয়ার পর এক সন্ধ্যায় আমরা কফি খেতে খেতে বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এক বন্ধু আফসোস করে বলল- খামাকা কেস করে , এতোগুলো ডলার অযথা খরচ হয়ে গেলো, এতে কার কি লাভ হলো বলেনতো? এক বন্ধু বলল, তবে শুনুন একটি গল্প, সে কৌতুক মাখানো একটি গল্প বলল "এক ব্যক্তি কোন এক হাট থেকে, একশত বিড়াল কিনলো, তিনশত টাকায়। সে ভেবেছিলো এর থেকে সে প্রচুর লাভ করবে। মহানন্দে ছালা ভরে তিনি বিড়ালগুলো বাড়ি নিয়ে এলেন। এক সপ্তাহ পর মহা বিরক্ত হয়ে তিনি, সেই হাটে যে দামে বিড়ালগুলো কিনেছিলেন, সে দামে বিক্রি করে দিলেন। পাড়ার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, এতে তোমার কি লাভ হলো?

দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে বলল, "খামচি"। এক সপ্তাহ ধরে বিড়ালগুলো ভদ্রলোককে খামচে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে।"

তদ্রুপ আজও আমাদের মাঝে সেই মনো-মলিন্যের কারণে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে আছে। সমাজে কিছু লোক আছে, শুধু দল পাকায়। এরা আজ এখানে তো কাল ওখানে। এদের এ ব্যবহার দেখে অনেকে বলেন "শয়তানের মিলন হয় বটে কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না।" এদের চাটুকারী কথায় বিশ্বাস করে, অনেকে ফাঁদে পা দেয়, মিথ্যা আশ্বাসে ভরসা করে, কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে আফসোস করে। কারণ কথায় বলে,

"মিথ্যার জয় প্রথম প্রথম
সত্যের জয় শেষে।"

খোদ আমেরিকায় যাকে বিশ্বের এক নম্বর গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়ে থাকে। সেখানেও আমরা আমাদের দেশীয় চরিত্র বদলাতে পারি না, যা সত্যিই দুঃখজনক ও লজ্জাস্কর। তাই জ্ঞানীলোকেরা বলেন

"কয়লা ধুলে যায় না ময়লা।"

ফলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে, অনেকে নানা অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এমনকি জনগণের কষ্টাজিত অর্থ আত্মসাৎ করতে দ্বিধাবোধ করে না। দেশে ফাদার ইয়াং এর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" গঠন করে গোটা খ্রিস্টান সমাজকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছেন। কতো হাজারো নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক, তাদের যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ঢাকাসহ প্রতিটি মিশনে এর গোড়া অত্যন্ত শক্তভাবে প্রথিত করে দিয়ে গেছেন। ঐ সমস্ত সংগঠনের নানা অর্থ কারচুপি, অযথা অর্থ ব্যয়, বিভিন্ন প্রকল্প ও নানা পার্টির রমরমা অবস্থা দেখে মনে সংশয় জাগে সত্যিই কি সব ঠিকঠাক আছে, নাকি এক সর্বনাশা ধ্বংস ধীরে ধীরে সব কিছু গ্রাস করবার জন্য ধেয়ে আসছে।

এই সুদূরে বসে প্রিয় সংগঠনগুলোর সুনামে মন যেমন আনন্দে নেচে উঠে, তেমনি কোন দুর্নামে হৃদয় দারুণভাবে কেঁপে উঠে। আমার দীর্ঘ সমাজ সেবাকালীন সময়ে, কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করতে দেখিনি। তখনও যে কোন ইস্যুকে ঘিরে আন্দোলন ছিলো, সমবায় অধিদফতরে মামলা করার হুমকি, নানা মিথ্যাচার অপপ্রচার কুৎসা রটিয়ে লিফলেট বিলানো হতো। একই সংবিধানের অধীনে সদস্যদের আচরণবিধির উপর শাস্তির বিধান তখনও ছিলো, যেমন আজও আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলোতে সামান্য সামান্য কারণে অহরহ সদস্যপদ বাতিল করা হচ্ছে, তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। বিধানটি এভাবে প্রয়োগ হতে থাকলে, এক সময় সমাজে ভাল নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে সমবায় আন্দোলনের এক জীবন্ত কিংবদন্তী সুবাস সেলেষ্টিন রোজারিওকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার দীর্ঘ সমবায় সেবায় সম্পৃক্ত থাকাকালীন কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করেছিলেন কিনা?

তিনি বললেন, সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু তা আলোচনা করে, আবার সমাধানও করতে সক্ষম হয়েছি। সদস্যপদ বাতিলের কথা কখনও চিন্তাও করিনি বরং আমি সদস্য পদ বাতিলের বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন, আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সংখ্যালঘু, সমুদ্রের একফোঁটা জল বিন্দু মাত্র, লোম বাছতে বাছতে কম্বলের দফা শেষ।" সুবাসদা সব সময় বিভিন্ন বক্তৃতায় একটা কথা প্রায়ই বলতেন, "Credit Union brings people together. There is no room for a dishonest and inefficient person in credit union".

প্রবাসে এসে দেখলাম একদল নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবকেরা দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে "Source and solution" নামে একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মূলত তিনটি স্টেট নিয়ে যেমন নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেকটিকাট এর সেবার আওতায় পরে। কর্মকর্তাদের অনুরোধে আমি সম্পৃক্ত হয়ে পনের জন সদস্যদের জায়গায় প্রায় দেড়শতাধিক সদস্য বানিয়ে সেবা দিতে শুরু করলাম। বেশ ভালই চলছিলো কিন্তু হঠাৎ সেই অনৈতিক ঝড় উঠলো। শোনা গেল কালেকশনের অর্থ ব্যাংকে জমা না হয়ে, নেতাদের পকেটে চলে যাচ্ছে। এমনকি অবৈধভাবে নামে বেনামে বড় বড় ঋণের অর্থ তুলে নেয়া হচ্ছে।

এ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অনেক দেন দরবার হলো। এদের হটিয়ে হুংকার দিয়ে অনেকে ক্ষমতা দখল করলো এবং যুদ্ধ ঘোষণা করলো যতো অনিয়ম হয়েছে, মই দিয়ে সমান করে ফেলবো। দুভার্গ্য সদস্যদের "যেয়ই লংকায় যায়, সেই রাবণ হয়"। এর প্রমাণ হাতে হাতে মিললো আগে যারা খেয়েছে "পুটি মাছের মতো ঠুকরে ঠুকরে" কিন্তু বিপ্লব ঘটিয়ে এবার যে নেতারা এলো, এরা ছিলো "রাঘব বোয়াল" একেবারে গ্রাস করে চলে গেলো। কথায় বলে "যোগ্যরা যোগ্য স্থানে গেলে বিনয়ী হয়, আর অযোগ্যরা যোগ্য স্থানে গেলে অহংকারী হয়ে।"

কাজের কাজ কিছুই হলো না। যারা শিকড়ের সন্ধান করে, তারা আজ সেই সংগঠনের শিকড়, কোথাও খুঁজে পাবে না। কারণ এর মূল সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে।

এটা সত্য যে, অযোগ্য-অপদার্থ নেতাদের তোষামুদে রাজনীতি বা সমাজ নীতি বেশি দিন চলে না। নানা ভেল্‌কিবাজী -চটকদার কথা বলে, "কিছু লোককে কিছু দিনের জন্য, বোকা বানানো যায় ঠিকই কিন্তু তা সব সময়ের জন্য নয়।"

সমাজে অনভিজ্ঞ বনাম অভিজ্ঞের লড়াই চিরকাল হয়ে এসেছে। যারা দেশে, তেমন কোন নেতৃত্ব দেয়নি বা সমাজ সেবার পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা নেই, হঠাৎ কোন বড় পদে অধিষ্ঠিত হলে, সর্বময় কর্তা বনে যায়, এদের কার্যক্রম দেখলে মনে হবে "মুই কি যে হনুরে।" যারা দেশে সুনামের সাথে সমাজ সেবা করেছে, এদের দাপটের কারণে, মানসম্মান বাঁচাতে, ক্রমান্বয়ে কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

যারা এদেশে নবাগত, দেশে অনেকে সমাজ সেবা করতে গিয়ে অন্যকে নানাভাবে লাঞ্চিত করেছে তাদের নানা অনৈতিক কাজের জন্য লাঞ্চিত হয়েছে। উন্নত দেশে এসেও স্বভাব কিন্তু বদলায়নি। তারা অভিজ্ঞতায় নিজেদের পরিপক্ক ভাবে, ভাবখানা এমন, আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। এরা কথায় কথায় অপমানজনক মন্তব্য করে, যেমন: ওমুকে সমবায় আইন বা নেতৃত্ব সম্বন্ধে কি জানে? এই সবজান্তা লোকগুলোর কথা ভাবলে মনে একটা প্রশ্ন জাগে, "অপমান করতে যোগ্যতা লাগে না, কিন্তু সম্মান করতে শিক্ষা লাগে।"

কথায় বলে, "উপকারীরে বাঘে খায়" ইমিগ্র্যান্টই হোক বা বেড়াতে এসে থেকে গেলেই হোক। নতুন জীবন ধারায় প্রতিষ্ঠিত হতে কারও না কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অনেকে আন্তকিভাবে বাসস্থান-চাকরি ইত্যাদির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন সময় সামাজিক সংগঠনগুলোতেও অনেকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, মানুষ অনেক অকৃতজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে সমস্ত ত্যাগস্বীকার ও অবদানের কথা ভুলে যায়। সামান্য "পান থেকে চুন খসলেই" বদনাম ও সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

তবে এটাই সত্য, বিশ্বাস করেন বা নাই করেন, যাদের জন্য আপনি দিনের পর দিন, স্বার্থত্যাগ করবেন, তারাই আপনাকে অপমান করবে, আপনার অবদানের কথা বেমালুম ভুলে যাবে।

বলা বাহুল্য, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বা স্পষ্ট করে বলতে হলে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে নিজেদের অপকর্ম, কারচুপি ঢাকতে, সংবিধানের ফাঁক গলিয়ে কেবল মাত্র দলে টিকে থাকতে সভাপতির মেয়াদ শেষ হবার পরও পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে না। নির্লজ্জভাবে নিজের আত্মীয় স্বজনকেও পদে ঢুকাতে কালক্ষেপণ করে না। আর দলে ভেড়াতে বা সম্মতি আদায় করতে যে মন্ত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তা হলো লাল ও সাদা পানির দৌরাত্ম্য। "মদে কোন ছোট-বড়, জ্ঞানী-গুণী, ভেদাভেদ নেই, একই সাথে বসে দিব্যি খাওয়া যায়।" যার লোভে বার বার ছুটে আসে মাদকাসক্তরা নানা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়, শপথ নেয় এবং বেহায়ার মতো ন্যায় অন্যায়ের কথা বিবেচনা না করেই, অকুণ্ঠ সমর্থন যোগায়। ফলশ্রুতিতে বোধ হয় এ ধরণের লোকদের কথা ভেবেই জনাব মির্জা গালিব বলেছিলেন, "পৃথিবীতে বেশি সংখ্যক মিথ্যা বলা হয়, ধর্মগ্রন্থ' ছুঁয়ে, আদালতে। বেশি সত্য বলা হয়, মদ ছুঁয়ে, পান শালায়।" এ মদ্য পানে নেই কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম। স্থান কাল পাত্র ভেদে এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। সামান্য পারিবারিক উৎসব থেকে শুরু করে, মহা প্রভুদের পার্বণেও চলে এর রমরমা কাণ্ড কারখানা। আর এই অতিরিক্ত মদ্য পানের কারণে, বাড়ছে অকাল মৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বন্ধু প্রিয়জনদের ছেড়ে, হরিবল হরিবল করতে করতে, স্বর্গধামে রওয়ানা হয়। এর ব্যথা কেবল ভুক্তভুগীরাই টের পায়। সমাজে কিছু স্বার্থপর লোক হঠাৎ নেতৃত্বে চলে আসে, আর কার্যসিদ্ধির জন্য অনেককে ব্যবহার করে।

"স্বার্থপর মানুষগুলো খুব ভাল করেই জানে,
কখন মানুষকে ব্যবহার করতে হয়,
আর কখন উপেক্ষা করতে হয়।"

এই অযোগ্যরাই কিন্তু "ধরাকে সরা জ্ঞান করে।" এদের গুরুজন বা বয়স্কদের প্রতি কোন শ্রদ্ধাভক্তি নেই। যে কোন সময় যে কাউকে অপমানজনক কথা বলতে পিছপা হয়না। ফলে পিতা-মাতার অশান্তির কারণে সন্তানরা যেমন কষ্ট পায়, তেমনি সামাজিক সংগঠনের নেতাদের কোন্দল, অপপ্রচার, মিথ্যা সমালোচনা, পরস্পরের প্রতি দোষারোপের কারণে, সাধারণ সদস্যরা বিভ্রান্ত হয়।

অথচ খ্রিস্টীয় সংগঠনে সেবা দিতে গিয়ে, আমরা ভুলে যাই প্রভু যিশুখ্রিস্টের অমর বাণী সকল- "অপরের সমালোচনা করার বিষয়ে শিক্ষা-পরের বিচার কোরো না। তাহলে তোমার বিচার কেউ করবে না। কারণ অপরের সঙ্গে তুমি যেমন ব্যবহার করেছ, অপরেও তোমার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করবে। যে পাল্লায় তুমি মাপবে সেই পাল্লায় তোমাকে মাপা হবে। তোমার ভাইয়ের কুটো নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো কেন? যখন তোমার চোখে একটা তক্তা আছে? তোমার নিজের চোখে তক্তা থাকতে তুমি নিজে ভাল দেখতে পাও না তবে কোন মুখে তোমার ভাইকে বলবে এসো তোমার চোখ থেকে কুটোটা বের করে দেই। ও হে ভণ্ড আগে তোমার চোখ থেকে তক্তাটি বের করে ফেল, তবেই তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে ও তখন তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটি বের করতে পারবে *(মথি ৭:১-৫)*।" আমরা ভুলে যাই, ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান

ঘুম আর মৃত্যু-ভাই ভাই,
শুধুমাত্র পার্থক্য-একটাই,
ঘুম ভাঙ্গলে-সকাল
না ভাঙ্গলে-পরকাল। ৯